সহযাত্রী

সহযাত্রী

ম্যাক্সিম গোর্কি

অনুবাদঃ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য

স্নেহাস্পদেষু

সহযাত্রী

ওদেসা বন্দরে তার সঙ্গে দেখা হয়। পর পর তিন দিন তার সবল সুগঠিত দেহ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ককেসীয় ছাঁদের মুখখানা সুদৃশ্য দাড়ির ফ্রেমে ঘেরা। অবিরত আমার চার পাশে সে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। আমি দেখেছিলাম পাথরে বাঁধানো পথের উপর সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রয়েছে: ছড়ির বাঁটটা মুখের মধ্যে পুরে, বাদামের আকৃতি কালো চোখের শূন্য দৃষ্টি বন্দরের ঘোলা জলে নিবদ্ধ। দিনে দশ বার সে আমার পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, ভাবনাবিহীন নিষ্কর্মার ভঙ্গি তার চলাফেরায়। লোকটা কে? আমি তাকে ভালো করে লক্ষ্য করতে থাকি। যেন আমার আগ্রহ উদ্দীপিত করবার উদ্দেশেই সে ঘন ঘন আমার সামনে দিয়ে এধার ওধার করতে থাকে। তার শিল্পীজনোচিত ফ্যাশনদুরস্ত হালকা রঙের চেক্-স্যুট, তার কালো টুপি, তার অলস আরামের ভঙ্গি—এমন কি, তার নিরুদ্যম ক্লান্ত দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত আমার অতি-পরিচিত হয়ে গেল। কেন যে সে এখানে আছে, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না; এই বন্দরে জাহাজের ও ইঞ্জিনের বাঁশি, শিকলের ঝনঝনানি, যারা কাজ করছে তাদের চেঁচামেচি, বন্দরের পাগল-করা ব্যস্ততা ও তাড়াহুড়ো—সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। স্নায়ু ও মস্তিষ্ককে অবশ করে দেয়। বন্দরের আশপাশে আর সবাই এই বিরাট জটিল যন্ত্রে জড়িয়ে আছে। ডুবে আছে অবিচ্ছিন্ন সতর্কতা ও অপরিসীম পরিশ্রমে। এখানে সবাই ব্যস্ত, জাহাজে কিংবা রেলে মাল তুলছে নামাচ্ছে। প্রত্যেকেই ব্যস্ত, চিন্তা-

ক্লিষ্ট। সবাই ছুটছে এদিক ওদিক, চেঁচাচ্ছে, গালাগালি করছে, তাদের সারা গায়ে ঘাম ও ময়লা। এই পরিশ্রম ও কর্মচাঞ্চল্যের পরিবেশে এই একটি মাত্র মানুষ বিরাজ করছে মৃতকল্প কর্মহীন চাঞ্চল্যহীন অনুভূতিহীন আলস্যবহন করে; কোন কিছুকে এতটুকু গ্রাহ্য না করে কি যেন উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ায়।

অগত্যা চার দিনের দিন খাবার ঘণ্টায় তাতে আমাতে দেখা হয়ে গেল। আমি মনস্থির করে ফেললাম, যে করেই হোক, বার করতে হবে লোকটাকে। রুটি আর তরমুজ নিয়ে তার থেকে একটু দূরে বসে গেলাম খেতে; তার দিকে লক্ষ্য করে ছুঁতো খুঁজতে লাগলাম, কি করে গল্প জমানো যায়।

লোকটা দাঁড়িয়েই আছে। কতকগুলি চায়ের বাক্সের উপর হেলান দিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, আর ছড়িগাছটির মাথায় আঙুল দিয়ে টোকা মারছে, বাঁশির ফুটোর উপর আঙুল চালাচ্ছে যেন। বাউণ্ডুলের মত আমার পোশাক, কাঁধের উপর কুলির মার্কা, কয়লার ধুলোয় সর্বাঙ্গ কালিমাখা—এ হেন মানুষ আমি, একজন পোশাক-দুরস্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ শুরু করা আমার পক্ষে কঠিন বই-কি। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম, যখন লক্ষ্য করলাম, লোকটা আমার দিক থেকে একবারো দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে না। তা ছাড়া, তার চোখে জ্বলছে একটা অশোভন লোভাতুর ও ক্ষুধাতুর পাশব দ্যুতি। আমার মনে হল, আমার এই ঔৎসুক্যের পাত্রটি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। তাড়াতাড়ি একবার চারদিকে তাকিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলামঃ 'খাবে?'

চমকে উঠল সে, ক্ষুধা-কাতর হাসিতে তার শক্ত সুস্থ সুন্দর দন্তপংক্তি বিকশিত করে। সেও একবার চারদিকে দেখে নিলে সংশয়ের দৃষ্টিতে। কেউ আমাদের দেখছে না। আমার তরমুজের আধখানা আমি ওর হাতে এগিয়ে দিই। আর দি একটুকরো রুটি। আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ও সরে পড়ে, একরাশ মালের আড়ালে গিয়ে বসে যায় মাটির উপর। মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে মাথাটা তার দেখা যায়, টুপিটা কপাল থেকে ঠেলে দিয়েছে, ঘামে ভেজা মলিন কপালটা দেখা যাচ্ছে। মুখে তার প্রশান্ত হাসি, কেন, জানি না, থেকে থেকে আমার দিকে তাকাচ্ছে সে, কিন্তু মুখ তার চলছেই।

একটু অপেক্ষা করবার জন্য ইসারা করলাম তাকে, তার পর চলে গেলাম কিছু মাংস কিনতে। ফিরে এসে ওর হাতে এগিয়ে দিলাম সেটা এবং বাক্সগুলির পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম, বাইরেব লোকের দৃষ্টি থেকে আমার এই দরিদ্র ফুলবাবুটিকে আড়াল করে। ও খেয়েই চলেছে, গোগ্রাসে গিলছে, আর বারে বারে তাকিয়ে দেখছে চারপাশে, যেন আশঙ্কা —কেউ তার খাবার কেড়ে নিতে পারে। এত তাড়াতাড়ি খাচ্ছে হাভাতের মত—আমারই কষ্ট হল এই দুস্থ ক্ষুধাকাতর লোকটিকে দেখে, পিছন ফিরে দাঁড়ালাম।

'ধন্যবাদ! সত্যি, অশেষ ধন্যবাদ!' আমার কাঁধের উপর একটা থাবা দিল এসে, টেনে নিল আমার হাতটা, চেপে ধরে সমগ্র অন্তর দিয়ে একটা ঝাঁকানি মারল।

পাঁচ মিনিট বাদে সে শুরু করে দেয় তার পরিচয়। জর্জিয়ার এক জমিদার-নন্দন, শাক্রো তাজে তার নাম। ককেসাস অঞ্চলে কুটেইর এক ধনী জমিদারের এক মাত্র পুত্র। নিজের দেশের এক রেল স্টেশনে কেরানীর কাজ করত, বাস করত এক বন্ধুর সঙ্গে। একদিন বন্ধুটি নিরুদ্দেশ হল তার টাকাকড়ি ও দামী জিনিস যা ছিল সব নিয়েই। শাক্রো স্থির করলে তাকে খুঁজে বার করবে, ধরবে তাকে। হঠাৎ শুনতে পেল, তার সেই ভূতপূর্ব বন্ধুটি বাতৌমের টিকেট কেটেছে। সে-ও রওনা হল সেদিকে। বাতৌমে এসে দেখল, বন্ধু চলে গেছে ওদেসায়। তখন কুমার শাক্রো এক বন্ধুর পাসপোর্ট ধার করলে, সেই ক্ষৌরকার বন্ধুটি বয়সে তার সমান কিন্তু চেহারায় এবং অভিজ্ঞান-সূচক চিহ্নে দু'জনের এতটুকুও মিল ছিল না। ওদেসায় হাজির হয়ে ও পুলিশে খবর দিলে। পুলিশও ব্যাপারটা তদন্ত করবার আশ্বাস দিলে। এক পক্ষকাল অপেক্ষায় থাকতে থাকতে পয়সাকড়ি সব খরচ হয়ে গেছে। কাজেই গত চার দিন ধরে একটা দানাও জোটে নি।

মন দিয়ে শুনলাম তার কাহিনী। মাঝে মাঝে গাল দিয়ে দিব্যি গেলে কথা বলছে। শুনে আমার সংশয় রইল না ওর আন্তরিকতা সম্বন্ধে। ওর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বিশ্বাস হল, দুঃখও হল ছেলেটার জন্য। ছেলেটাই বটে। বয়স হয় ত উনিশ কিন্তু তার সরল

ব্যবহার দেখে আরও কম বলে মনে হয়। বার বার ফিরে ফিরে নিদারুণ রাগে তার এই কথাই মনে হচ্ছে, যে-লোকটা মহার্ঘ সম্পত্তি হরণ করে নিয়ে গেল সেই চোরের সঙ্গে কেমন করে সে নিবিড় বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। শাক্রোর বুড়ো বাপ যা কড়া লোক, সম্পদ উদ্ধার না হলে ছেলের বুকেই হয় ত ছুরি বসিয়ে দেবে।

আমি ভাবলাম, ছোকরাকে যদি সাহায্য না করি, এই লোলুপ শহর ওকে গিলে ফেলবে। কি সামান্য অবস্থায় পড়ে মানুষ গৃহহীন বাউণ্ডুলের দলে ভরতি হয় তা আমি জানি। তাই মনে হল, কুমার বাহাদুরের সে দলে পড়ে যাওয়া একটুও বিচিত্র নয়। সে দলের সম্মানবোধ আছে, কিন্তু কেউ সম্মান করে না তাদের। মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা জাগল, ওর সহায়তা করব। আমি এত রোজগার করি না যে, ওকে বাতোমের একটা টিকেট কিনে দিতে পারি। তাই রেল আপিসে এসে হাজির হলাম, বিনা পয়সার টিকেটের জন্য আবেদন জানালাম। এই যুবকটিকে সাহায্য দেওয়ার পক্ষে বেশ ভাল ভাল যুক্তি দিলাম আমি, কিন্তু প্রত্যাখ্যান এল তার চেয়েও ভারী যুক্তিতে। শাক্রোকে উপদেশ দিলাম, এই শহরের পুলিশের বড় সাহেবকে দরখাস্ত দেবার জন্য। শাক্রো কিন্তু এতে অস্বস্তি বোধ করে; অস্বীকার করে সেখানে যেতে। কেন নয় শুনি? শাক্রো বুঝিয়ে দেয়। যে হোটেলে ছিল ও, ঘর ভাড়া দেয়নি সেখানে। তাগাদা করতে এলে মেরে বসেছে একজনকে। তাই সে আত্মগোপন করে থাকতে চায়। কারণ, ওর বিশ্বাস, আর সে বিশ্বাস অযৌক্তিকও নয় যে, পুলিশ যদি ওকে খুঁজে পায় তবে টাকা না দেওয়ার কৈফিয়ৎ ত ওকে দিতেই হবে, আর মারধোর করার অভিযোগও এড়াতে পারবে না। তা ছাড়া, তার মনেই নেই, কটা ঘুষি মেরেছিল সেদিন, একটা, দুটো, না অনেকগুলো।

ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

আমি স্থির করি, ওকে বাতোমে পেঁছে দেবার উপযুক্ত টাকাটা কামাতে হবে। কিন্তু হায়, বুঝতে দেরি হল না, কাজটা এত তাড়াতাড়ি হবে না। কোন মতেই না। কারণ, আমার এই হাভাতে কুমার বাহাদুর তিনজনের খোরাক খান। হয় ত তারও বেশি। রুশিয়ার দুর্ভিক্ষ-

পীড়িত উত্তরাঞ্চল থেকে ক্রিমিয়ায় তখন অনেক চাষী এসে হাজির হয়েছে। ডকের কাজে মজুরির হারও অনেক কমে গেছে তার ফলে। দিনে আশী কোপেকের বেশি কামাতে পারি না। আর দুজনের খোরাকিতেই খরচ ষাট কোপেক।

ওদেশাতে আর বেশি দিন থাকবার ইচ্ছে নেই। কারণ জমিদার-নন্দনের সঙ্গে দেখা হবার আগেই ক্রিমিয়ায় যাব স্থির করেছিলাম। কাজেই আমি প্রস্তাব করলাম, পায়ে হেঁটে ক্রিমিয়ার দিকে রওনা হব। আর সেখানে আর একজন সঙ্গী জুটিয়ে দেবো ওকে যে ওকে তিফলিসে নিয়ে যাবে। আর যদি একজন সহযাত্রী না-ই জুটিয়ে দিতে পারি, তা হলে আমি নিজেই যাব সঙ্গে কথা দিলাম।

কুমার বাহাদুর অত্যন্ত বিষণ্নভাবে তার সুন্দর জুতো জোড়া, তার টুপি ও পাত্‌লুনের দিকে তাকাল। কোটটার গায়ে হাত বুলিয়ে নিল একবার। একটু চিন্তা করে ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে অগত্যা রাজী হল। এবার আমরা রওনা হলাম, ওদেসা থেকে তিফলিস, পায়ে হেঁটে পাড়ি।

দুই

খারসনে পৌঁছবার পথেই আমার সঙ্গীর সম্বন্ধে কিছু পরিচয় পেলাম। তার স্বভাবে রয়েছে একটা সহজ বন্যতা। এই অপরিণত তরুণ পেটভরা থাকলে খুশিতে ভরপুর থাকে। আর খিদে পেলেই একেবারে মিইয়ে পড়ে; একটা বলিষ্ঠ সহজ প্রকৃতির জানোয়ার যেন। পথ চলতে চলতে সে আমাকে ককেসাসের জীবন সম্বন্ধে নানা কথা বলে। জমিদারদের সম্বন্ধে বলে অনেক কাহিনী, তাদের আমোদ-প্রমোদের কথা, চাষীদের প্রতি তাদের আচরণ, আরও অনেক কিছু। গল্পগুলি শুনতে ভাল লাগে, আর তার মধ্যে একটা রসও আছে। কিন্তু কাহিনীগুলি বক্তা সম্বন্ধে আমার মনে একটা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে দেয়।

একটা উদাহরণ দিইঃ

একবার এক জমিদার-নন্দন কয়েকটি বন্ধুকে ভোজে নিমন্ত্রণ করে আনে। নানা রকম ককেসীয় মদের সঙ্গে বহুবিধ ভূরিভোজের শেষে কুমার বাহাদুর তার অতিথিদের নিয়ে যায় তার আস্তাবলে। তারা এক একটা ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে নেয়, কুমার বেছে নেয় সবচেয়ে সুন্দর ঘোড়াটা। তার পর চরতে বেরোয় ক্ষেতের দিকে। বেশ তেজাল ঘোড়া সেটা। বন্ধুরা তার প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। কুমার বাহাদুর আর একবার ক্ষেতের উপর ঘোড়া চালিয়ে দেয়। ঠিক সেই সময় এসে হাজির হয় এক চাষী, অপূর্ব সাদা একটা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কুমারকে ধরে ফেলে আর সগর্ব হাসিতে ফেটে পড়ে। এতগুলি অতিথির সামনে লজ্জা পায় কুমার, তার ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, সামনে এগিয়ে আসবার জন্য চাষীকে ইঙ্গিত করে। তারপর তরোয়ালের এক কোপে তার মুন্ডটা দুখানা করে ফেলে। পিস্তলটা বার করে সাদা ঘোড়াটার কানের ভিতর দিয়ে গুলি চালিয়ে দেয়। এর পর গিয়ে সে ধরা দেয় পুলিসের হাতে। বিচারে তার যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

শাক্রোর বলার ভঙ্গীতে আগাগোড়া ওই জমিদার-নন্দনের প্রতি একটা করুণার ভাব প্রকাশ পায়। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি, দয়া সে অপাত্রে অর্পণ করেছে।

'জমিদারের ছেলে ক'টা আছে?' বক্তৃতার সুরে বলে শাক্রো, 'চাষীর সংখ্যা ত অগুণতি। একটা চাষীর জন্য একজন জমিদারের ছেলেকে সাজা দেওয়া কখনই ন্যায্য হতে পারে না। চাষীগুলো কি? এর চেয়ে একটু বেশি নয়—' বলতে বলতেই এক মুঠো মাটি তুলে নেয়। আরও বলে, 'জমিদার-কুমার হল আকাশের তারা।'

ব্যাপারটা নিয়ে বেশ খানিকটা তর্ক চলল আমাদের এবং ও রীতিমত রেগে গেল। ক্রুদ্ধ অবস্থায় এমনভাবে দাঁত দেখালো, যেন একটা বুনো নেকড়ে। তার মুখের আকৃতিতে লক্ষণগুলো প্রকট হয়ে ফুটে ওঠে।

'ম্যাকসিম, ককেসাসের জীবন সম্বন্ধে কিছু জানো না তুমি, অতএব মুখ সামলে থাকো,' সে চেঁচিয়ে ওঠে।

আমি যতই যুক্তি দিই, তার মনের সহজাত বদ্ধমূল ধারণা বদলাতে পারি না। আমার কাছে যা স্পষ্ট, ওর কাছে তা অসম্ভব। আমার যুক্তি ঢোকে না ওর মগজে। কিন্তু আমাব মত যে ওর মতের চেয়ে যুক্তিযুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ একথা প্রমাণ হলেই ও বলে ওঠেঃ

'তা হলে যাও, ককেসাসে গিয়ে কিছু দিন থেকে এসো, দেখবে আমার কথাই ঠিক। সবাই যা করে, নিশ্চয়ই তা ঠিক। তুমি যা বলছ, তা মানতে যাব কেন? এ সব যে অন্যায়, এ একমাত্র তুমিই বল। হাজার হাজার লোক বলে, এই হল ঠিক।'

আমি চুপ করে যাই, বুঝতে পারি, কথায় এখানে কাজ হবে না; যার বিশ্বাস, জীবন-ধারা যেমন চলছে তাই সত্য এবং ন্যায়সম্মত, তাকে বোঝানো যাবে শুধু বাস্তব ঘটনা দিয়ে। আমি চুপ করে থাকি, কিন্তু সে থাকে বিজয়ীর ভাব নিয়ে: কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস, জীবনকে সে চেনে, আর সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান অটল, কোথাও ফাঁক নেই সেখানে, কেউ কোনদিন খণ্ডাতে পারবে না তা। আমার নীরবতার ফলে সে যেন ককেসাসের জীবন-কাহিনী আরও পরিপূর্ণভাবে বিবৃত করবার উৎসাহ পায়। সে জীবনে কি বন্য সমারোহ, কি উত্তাপ, কি স্বকীয়তায় ভরপুর। এই গল্পগুলি আমাকে আকৃষ্ট করছিল ঠিকই, কিন্তু এই নিষ্ঠুরতা, এই বিত্তের উপাসনা, এই জোর ফলানোর প্রয়াস —সর্বমানুষের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য নীতিবোধের একান্ত অভাব— আমার ক্রোধের উদ্রেক করতে থাকে।

একবার তাকে জিজ্ঞাসা করি, যীশু খৃস্টের উপদেশ সম্বন্ধে সে অবহিত কি-না। 'তা আর জানি না!' অবজ্ঞার সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে সে।

এ বিষয়ে তাকে সম্যক পরীক্ষা করে যা বুঝলাম তাতে তার জ্ঞান দেখলুম এই পর্যন্তঃ যীশুখৃস্ট নামে একটি লোক একদা ইহুদিদের আইনের প্রতিবাদ করে তাদেরই দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল। তবে

ভগবান বলে ক্রুশে সে মারা যায় নি, স্বর্গারোহণ করে দুনিয়াকে এক নব-বিধান দিয়ে গেছেন।

'সেই বিধানটা কি?' আমি জানতে চাই। শ্লেষভরা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমাকে এক ঝলক দেখে নেয়, তারপর বলে, 'তুমি কি খৃস্টান? আরে খৃস্টান ত আমিও। দুনিয়ার প্রায় সব লোকই ত খৃস্টান। তবে তুমি জিজ্ঞাসা কর কেন? তারা সবাই কিভাবে জীবন যাপন করে তা তুমি জান। খৃস্টের বিধান অনুসারেই ত!'

বুঝতে পারলাম, তার হৃদয়ে আবেদন করে ফল নেই, তাই আর একবার তার বুদ্ধিকে নাড়া দিতে চাইলাম। পরস্পর সহায়তা, জ্ঞান এবং বিধান মেনে চলার উপকারিতা বোঝাতে চেষ্টা করলাম। বললাম, 'নীতিই বড় কথা, তার উপরে কিছু নেই।'

'যার শক্তি আছে সে নিজেই ত আইন। তার শিক্ষারও প্রয়োজন নেই কিছু, অন্ধ হলেও পথ চিনে নেবে সে।' আলস্যভরে জবাব করে কুমার শাক্রো।

একথা ঠিক, নিজের সম্বন্ধে তার কোন ফাঁকি নেই। এর জন্য আমি ওর প্রতি শ্রদ্ধাও বোধ করি। কিন্তু ও যে একেবারে বন্য, নির্দয়তার চরম নিদর্শন—এর জন্যে মাঝে মাঝে একটা ঘৃণার ভাবও চকিতে খেলে যায় আমার মনে। তবুও ওর সঙ্গে মিল হবার কোন কিছু পাওয়া যাবে, একে অপরকে বুঝতে পারব, মিলনের কোন না কোন সেতু রচনা সম্ভব হবে—এ আশা আমি ছাড়ি না।

আমি ওর সঙ্গে সহজতর ভাষায় কথা কইতে শুরু করি—যেন মনের দিক থেকে পা মিলিয়ে চলতে পারি দুজনে। আমার এ চেষ্টা ও লক্ষ্য করে কিন্তু মনে হয় এর অর্থ ও ভুল বোঝে। ধরে নেয়, ও যে আমার চেয়ে উচ্চস্তরের মানুষ—এটা আমি স্বীকার করে নিয়েছি। আর তারই ফলে কথায় বার্তায় আরো মুরুব্বিয়ানা শুরু করে দেয়। জীবন সম্বন্ধে তার যে ধারণা তার কঠিন প্রাচীরে আঘাত পেয়ে আমার সব যুক্তিতর্ক টুকরো টুকরো হয়ে যায়—একথা যেদিন বুঝতে পারি সেদিন সত্যি মর্মাহত হয়ে পড়ি।

তিন

পেরেকফ্ পিছনে ফেলে আসি কদিনেই। এবার ক্রিমিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের দিকে এগোতে থাকি। গত দুদিন দিগন্তে পাহাড়ী রেখা-গুলি চোখে পড়ছে, নিষ্প্রভ নীল রঙের পর্বতশ্রেণী, পেঁজা তুলোর রাশের মত মনে হচ্ছে। দূর থেকে দেখে খুব ভাল লাগল আমার, ক্রিমিয়ার দক্ষিণ উপকূলের স্বপ্ন জাগল চোখে। কুমার তখন গুন গুন করে জর্জিয়ার সুর ভাঁজছে, মন তার বিষন্ন। রেস্ত যা ছিল সব খরচ হয়ে গেছে, আর এই সব অঞ্চলে যে কিছু কামিয়ে নিতে পারি এমন ভরসাও নেই।

ফিওদসিয়ার দিকে পা বাড়ালাম। সেখানে একটা নতুন পোতাশ্রয় তৈরি হচ্ছে। কুমার সাহেব বললেন তিনিও কাজ করবেন, অতএব দুজনে মিলে প্রয়োজন-মত অর্থ উপার্জন হয়ে গেলেই আমরা জাহাজে করে বাতৌম রওনা হতে পারব। শাক্রো বলে, বাতৌমে তার অনেক বন্ধু আছে, আর তাদের সহায়তায় আমাকে একটা কাজ নিশ্চয়ই যোগাড় করে দিতে পারবে। কোন বাড়ীর দরোয়ান বা পাহারাদার। মুরুব্বির মত পিঠে আমার একটা থাবড়া দেয়, তারপর জিভ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে আলগা সুরে বলে ওঠেঃ

'তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবো। নতুন জীবনের সন্ধান পাবে তুমি। প্রচুর মদ জুটবে, আর মাংস যত খেতে পার। একটা গোলগাল জর্জিয়ান মেয়ে বিয়ে করতে পার, জর্জিয়ার খাবার রেঁধে খাওয়াবে সে। আর দেবে তোমাকে সন্তান—অনেক অনেকগুলি।' জিভ দিয়ে আবার চক্ চক্ শব্দ করে।

বার বার তার জিভের এই অদ্ভুত আওয়াজ আমাকে প্রথমটায় কিছুটা বিস্মিত করে ছিল, তারপর এতে আমার রাগ হয়। শেষ পর্যন্ত বিষাদে মনটা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। রুশিয়ায় আমরা শুয়োরকে ডাকার জন্য এই শব্দ করি, কিন্তু ককেসাসে বোধ হয় সুখ ও দুঃখ আনন্দ ও বেদনার প্রকাশ হয় এতে।

শাক্রোর চোস্ত পোশাক এরই মধ্যে নোংরা হয়ে উঠেছে। তার খাসা

বুট জোড়া ফেটে গেছে অনেক জায়গায়, টুপিটা ও ছড়িগাছটা খারসনে বেচে দেওয়া হয়েছে, টুপির বদলে মাথায় পরবার জন্য ও এক রেলের কেরানীর পোশাকী টুপি কিনে নিয়েছে। প্রথম যখন সেই টুপিটা মাথায় পরে, একদিকে খানিকটা বাঁকিয়ে নিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন মানাচ্ছে আমাকে? ভাল দেখাচ্ছে না?'

চার

শেষ পর্যন্ত ক্রিমিয়ায় এসে পোঁছলাম। সিমফেরোপোল পিছনে ফেলে ইয়াল্‌টার দিকে এগুচ্ছি। আমি চুপচাপ হেঁটে চলেছি, মন আমার আবেশে ভরা, চার দিকে সাগরের আলিঙ্গনে ঘেরা সেই ফালি জমিটুকুর সৌন্দর্যে বিস্ময়বোধ করছি।

কুমার বাহাদুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর অভিযোগ জানায়; নিজের সর্বাঙ্গে অবসন্ন দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়, আর বুনো ফল ছিঁড়ে শূন্য পেট ভরাবার চেষ্টা করে। কোন্ ফলে কি পুষ্টি আছে ভাল করে জানে না সে, তার পরীক্ষাও সব সময় সন্তোষজনক হয় না। মাঝে মাঝে রুক্ষ মেজাজে বলে ওঠেঃ

'এই সব আজেবাজে জিনিস খেয়ে আমার শরীরটা যদি ওলট পালট হয়ে যায়, তবে আর এগোবো কি করে? তখন করব কি?'

কিছু খাওয়ার সম্ভাবনাই নেই আমাদের, এক টুকরো রুটি কিনবো —একটা কপর্দকও নেই সঙ্গে। জীবন ধারণের একমাত্র উপায় এখন বুনো ফল, আর ভবিষ্যতের আশা।

কুমার সাহেব আমাকে গাল পাড়ছে, আমার নাকি উদ্যম নেই, আমি নাকি কুঁড়ে—বলছে, 'হাঁ করে তাকিয়ে থাক শুধু।' মোটের উপর আমার বিরক্তি ধরে গেছে। কিন্তু সব চেয়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটত, ও যখন ওর খিদের আজগুবি গল্প শুরু করে দিত। গল্প মারে, সকাল বেলায় এক পেট ভেড়ার রোস্ট আর তার সঙ্গে তিন বোতল মদ খেয়ে আবার দুটোর সময় অনায়াসেই সে তিন বাটী সুপ, একথালা পোলাউ, এক-থালা মাংস শেষ করে দিতে পারে, অবশ্য মদও চাই তার সঙ্গে প্রচুর

পরিমাণে। দিনের পর দিন সারাক্ষণ সে শুধু তার ঔদরিক রুচি ও জ্ঞান জাহির করে চলে, আর তা বলতে বলতে ঠোঁট দুটো চাটে জিভ দিয়ে, চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁট ফাঁক করে দেখায়; কথা বলতে বলতে জিভে জল আসে, আর ঢোক পেড়ে সেটা গিলে ফেলে। ওর এই চরিত্র দেখে আমার মনে জেগেছে গভীর বিরাগ, লুকোতেও পারি না সব সময়। ইয়ালটার কাছে এসে একটা কাজ পেলাম—বাগানে মরা ডাল সাফ করার কাজ। পঞ্চাশ কোপেক আগাম পেলাম, আর সব দিয়েই কিনে আনলাম মাংস আর রুটি। সওদা করে ফিরতে না ফিরতেই মালী এসে ডেকে নিয়ে গেল কাজে। শাক্রো কিন্তু গেল না, মাথা ধরার অছিলায় সরে রইল। আমাকে অগত্যা রুটি মাংস সবটাই ওর কাছে রেখে যেতে হল। ঘণ্টা খানেক বাদে যখন ফিরে এলাম, আমাকে মেনে নিতে হল যে, শাক্রোর ঔদরিকতা সম্বন্ধে কাহিনী-গুলো মোটেই আজগুবি নয়। একটা টুক্‌রোও পড়ে নেই। শাক্রো যা করেছে, তা বন্ধুর কাজ নয়, তবুও ভাবলাম—যাক্‌গে। পরে অবশ্য আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে আমি ভুল করেছিলাম।

আমার নীরবতা শাক্রো উপেক্ষা করে নি। তার মতন করে সুবিধে করে নিয়েছে। কারণ, এর পর থেকে আমার প্রতি তার ব্যবহার দিনে দিনে একেবারে নির্লজ্জ হয়ে ওঠে। আমি কাজ করি, ও খায়, মদ গেলে, আর আমার উপর হুকুম চালায়। নিজে কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ করে না—একটা না একটা ছুঁতো খুঁজে বার করে। আমি টল্‌স্‌টয়ের চ্যালা নই। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর যখন দেখি এই সুস্থ সবল ছেলেটা আমার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, পথ চেয়ে বসে আছে এক ছায়াঘেরা কোণে, তখন মজা লাগে, দুঃখও হয়। কিন্তু ভীষণ খারাপ লাগে যখন কাজ করার জন্যে ও আমাকে টিটকিরি দেয়। ও ভিক্ষে করতে শিখেছে আর আমাকে মনে করছে নিষ্প্রাণ পুতুল একটা, —তাই ত ওর টিটকিরি। ও যখন প্রথম ভিক্ষা শুরু করে, আমি দেখব ভেবে লজ্জা পেত, কিন্তু সে লজ্জা কেটে গেল ক'দিনেই; একটা তাতার পল্লীতে এসে সে খোলাখুলি ভিক্ষার জন্য তৈরি হল। লাঠির উপর ভর করে একটা পা এমন ভাবে টেনে চলে, যেন ও খোঁড়া। ও বেশ ভাল

করেই জানে, তাতারগুলো ছোটলোক, কোন সুস্থ সবল মানুষকে কখনও ভিক্ষা দেবে না। আমি ওর সঙ্গে তর্ক করি, ওকে বোঝাতে চেষ্টা করি, কত বড় লজ্জাকর কাজে নেমেছে ও। প্রত্যুত্তরে আমাকে শুধু টিটকিরি শুনতে হয়।

'আমি কাজ করতে পারি না', ও স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেয়।

ভিক্ষেয় কিন্তু বেশি কিছু মেলে না।

আমার শরীরটা তখন ভেঙে পড়ছে। প্রতিদিন পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে বেশি, দিনে দিনে আমাদের সম্পর্ক তিক্ততর হয়ে উঠছে। শাক্রো এখন বেহায়ার মত খোলাখুলি দাবি করছে. তার খাবারের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে।

'তুমিই ত', বলে শাক্রো, 'তুমিই ত এখানে এনেছ আমাকে। এত পথ বেয়ে; তুমি খাওয়াবে না ত কি? এত পথ আমি জীবনে কখনো হেঁটেছি! আমি কখনো পায়ে হেঁটে এ যাত্রা শুরু করতাম না। মেরে ফেলবার যোগাড় করেছ আমাকে। মনের সুখে অত্যাচার চালাচ্ছ। আমার প্রাণটা নিংড়ে বার করে নিচ্ছ। ভেবে দেখো, আমি মরলে কি কাণ্ডটা হবে--মা কাঁদবে, বাবা কাঁদবে, সব বন্ধুরা কাঁদবে। একবার ভেবে দেখো, কতখানি চোখের জল বইবে।'

কথাগুলি মন দিয়ে শুনি, কিন্তু রাগ হয় না আমার। একটা অদ্ভুত চিন্তা মনের মধ্যে জাগে, আর তারই জোরে আমি ধৈর্য ধরে ওকে সহ্য করি। কতবার আমার পাশে ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে দেখি, ওর শান্ত নিশ্চিন্ত মুখের দিকে তাকাই, আর মনে মনে ভাবতে থাকি যেন কোন নতুন অনুভূতির সন্ধান করছিঃ

'ও আমার সহযাত্রী—আমার সহযাত্রী!'

মাঝে মাঝে একটা ক্ষীণ চিন্তা এসে মনে আঘাত করে, যাই হোক না কেন, শাক্রো যে আমার সহায়তা এবং যত্ন এত সহজভাবে ও এতখানি জোরের সঙ্গে দাবি করে, বোধ হয় অন্যায় নয় তা। এতে ওর ইচ্ছা-শক্তির প্রবলতাই প্রমাণিত হয়। ও আমাকে দিনে দিনে বেঁধে ফেলছে, আর আমি তা মেনে নিচ্ছি, ওর চরিত্র বোঝবার চেষ্টা করছি। ওর মুখের প্রতিটি পেশী সঞ্চালনের অর্থ সন্ধান করছি, ভাবতে চেষ্টা

করছি, কবে কোন্ অবস্থায় এসে ও আর একজনের ব্যক্তিত্বকে এমনি-ভাবে খুঁড়ে খাবার চেষ্টা ছাড়বে।

'শাক্রোর দিল্ কিন্তু শরীফ। গান গায়, ঘুমোয় আর যখন খুশি আমায় ঠাট্টাটিটকিরি করে। মাঝে মাঝে দু-তিন দিন সরে থাকি, কিছু রুটি আর যদি থাকে ত কিছু পয়সা ওকে দিয়ে বলে দিই আবার কোথায় দেখা হবে। ছাড়াছাড়ির সময় ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে—সন্দিহান রোষায়িত দৃষ্টি নিয়ে। কিন্তু আবার যখন দুজনের দেখা হয়, বিজয়ীর আনন্দ-হাস্য নিয়েই ও আমাকে অভ্যর্থনা করে। হাসতে হাসতে বলে, 'ভেবেছিলাম, একাই পালিয়েছ আমাকে ফেলে রেখে। হাঃ হাঃ হাঃ!' আমি ওর জন্যে খাবার নিয়ে আসি—যে সব সুন্দর জায়গা দেখে এসেছি তার গল্প করি ; এমন কি একবার বাখ্‌সেসরাই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রুশ-কবি পুশকিনের কথাও পাড়লাম। কতকগুলি কবিতাও আউড়ে ফেললাম, কিন্তু ওর মনে তাতে কোন অনুভূতির সৃষ্টি হল না।

'ও, তুমি কবিতা বলছ, তাই কি? দেখ, কবিতার চেয়ে গান ভাল। আমি একটা জর্জিয়ানকে জানতাম! সে-ই শুধু গাইত গান! এত জোরে চেঁচিয়ে গাইত সে, মনে হত, গলা বুঝি চিরে গেল। শেষ পর্যন্ত সে সরাইওয়ালাকে খুন করল, নির্বাসিত হল সাইবেরিয়ায়।'

প্রতিবার ফিরে আসি আর শাক্রোর চোখে আরও ছোট হয়ে যাই ; শেষ পর্যন্ত আমার প্রতি ঘৃণা ও আর লুকোতে পারে না। অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে আসে। সপ্তাহে বড় জোর এক রুব্‌ল্ বা দেড় রুবল্‌-এর বেশি কামানো বরাতে জোটে না। আর বলা বাহুল্য, দুজনের খোরাক তাতে হয় না। ভিক্ষে করে শাক্রো যৎসামান্য পায়, তাতে সুরাহা হয় না কিছুই। কারণ, তার পেট অতল গভীর--যা কিছু পড়বে সেখানে, সব ডুবে যাবে ; আঙুর, তরমুজ, নোনা মাছ, রুটি, শুকনো ফল—সব কিছু। আর যত দিন যায়, আরো বেশি খাবার প্রয়োজন ওর বেড়ে চলে।

'অবিলম্বে ক্রিমিয়া ছেড়ে রওনা হওয়ার জন্য শাক্রো তাড়া দিতে থাকে, হয়ত তা অযৌক্তিক নয়। কারণ সে বলে হেমন্ত শীগগির নেমে

আসছে, আর যেতেও হবে অনেক দূরের পথ। শাক্রোর যুক্তি আমি স্বীকার করে নিই, তা ছাড়া, এতদিনে ক্রিমিয়ার প্রায় সব অঞ্চলই আমার দেখা হয়ে গেছে। এবার তাই ফিওদসিয়ার দিকে রওনা হই। আশা, সেখানে হয়ত কিছু রোজগার করতে পারব। আমাদের খাবার আবার এসে দাঁড়াল বুনো ফলে, আর ভবিষ্যতের আশা।

হায় ভবিষ্যৎ! এর উপর মানুষ এতখানি আশার বোঝা চাপায় যে সেই ভবিষ্যৎ যখন বর্তমানে এসে দাঁড়ায়, তার সবটুকু মাধুর্য নিঃশেষ হয়ে যায়।

আলুশ্‌তা পৌঁছবার মাইল পনর আগে আমরা যথারীতি নৈশ বিশ্রামের জন্য থামলাম। সমুদ্রতীর ধরে যাবার জন্য শাক্রোকে রাজী করিয়েছিলাম। ঘুরপথ হলেও সমুদ্রের মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নিতে আমার খুব ভালো লাগে। একটা আগুন জেলে শুয়ে পড়লাম তার পাশে। অপূর্ব সে রাত। ঘনশ্যাম সাগরতরঙ্গ আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে, মাথার উপর নীলাকাশের শান্ত সমারোহ, চার পাশে সুগন্ধ গাছ এবং ঝাড়জঙ্গলে বাতাসের মৃদু শব্দ কানে আসছে। চাঁদ তখন উঠি-উঠি। দীর্ঘাকৃতি সবুজ গাছগুলির ক্ষীণ ছায়া পাথরের উপর ঝিলিমিলি বসিয়েছে। অদূরে কোথায় যেন একটা পাখী ডাকছে, তার স্বর যেমন স্পষ্ট তেমনি দৃপ্ত। জলের ছল্‌ছলানির মৃদু স্পর্শ সংবাহিত বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে সে সুরের রেশ। তার পরের স্তব্ধতাটুকু ভেঙে দিলে একটা ঝিঁঝিঁর ভীরু ডাকে। আগুন জলছে জলু জলু করে। লাল ও হলদে ফুলে ভরা গাছের ডালের মত মনে হচ্ছে তার শিখাগুলি। আমাদের চারপাশে চঞ্চল ছায়াগুলি নৃত্য করছে; চাঁদের ছায়ার ধীর অগ্রগতির তুলনায় তাদের গতি-শক্তিতে যেন গর্ববোধ করছি। মাঝে মাঝে অদ্ভুত কি সব শব্দ ভেসে আসছে হাওয়ায়। সামনেই সাগর, তার অসীমতা হারিয়ে গেছে দিগন্তে, মাথার উপর নীল আকাশে এককণা মেঘও দেখা যাচ্ছে না। আমার কেমন মনে হল, আমি পৃথিবীর এক প্রান্তে শুয়ে আছি। অনন্ত আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সমাধানের সন্ধান করছি যে রহস্য অবিরত আমাদের হৃদয়ে হানা দেয়। রাত্রির এই রাজসিক রূপ

আমাকে নেশা ধরিয়ে দিল, বর্ণ, শব্দ ও গন্ধের সমাবেশের মধ্যে হারিয়ে ফেললাম নিজেকে।

একটা ভয় ও বিস্ময়ের ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল। মনে হল, যেন বিরাট একটা কিছু আমার অতি কাছে এসে পড়েছে। জীবনানন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল আমার সমগ্র সত্তা।

হঠাৎ আমার মোহ ভেঙে দিয়ে অট্টহাস্য করে উঠল শাক্রো, 'হাঃ হাঃ হাঃ! কি বোকার মত দেখাচ্ছে তোমার মুখটা! আর মাথাটা ঠিক যেন ভেড়ার মাথা! হাঃ হাঃ হাঃ!'

আমি চমকে উঠলাম, একটা বাজ পড়ার মত শব্দ হয়েছে যেন। বোধ হয় তার চেয়েও ভয়াবহ। হাসির বিষয়ই বটে, কিন্তু কি অপমান রয়েছে তার মধ্যে!

হাসতে হাসতে শাক্রোর চোখে জল এল। আমারও কান্না পাচ্ছিল, কিন্তু তার কারণ অন্য—গলায় কি যেন একটা আটকে গেছে, কথা বলতে পারছি নে। বিভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে ঠায় তাকিয়ে আছি ওর দিকে। ও কিন্তু এতে আরও বেশি করে মজা পায়। হাসতে হাসতে একেবারে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। আমার পক্ষে এ অপমান সহ্য হল না—কি ভীষণ অপমান! জীবনে অনুরূপ অভিজ্ঞতা যদি কারুর ঘটে থাকে, মনে হয় তার পক্ষেই সম্ভব হবে আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারা। কি তিক্ততা তাদের মনে জেগেছিল মনে পড়বে সে কথা। 'দূর হ!' আমি রাগের চোটে গর্জে উঠলাম।

হঠাৎ থমকে গেল শাক্রো, ভয়ও পেল, কিন্তু সংগে সংগেই হাসি বন্ধ করতে পারলে না। চোখদুটো ঘুরছে, গালদুটো ফুলে উঠেছে, এখনি যেন ফেটে পড়বে। সত্যি ফেটে পড়ল আবার হাসিতে। আমি উঠে সেখান থেকে সরে গেলাম।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারি করে বেড়াই, কিছু কানে আসে না, মনে আর কোন অনুভূতি নেই, চার পাশে যা-কিছু আছে বা ঘটছে সর্ববিষয়ে মন আমার নির্বিকার; সমস্ত অন্তর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমি একা এই অনুভূতি ও অপমানের তীব্র বেদনায়। মনের দিক দিয়ে সমগ্র প্রকৃতিকে আমি আলিঙ্গন করছি। এতটুকু কাব্যানুভূতি

যার মধ্যে আছে তার মনের স্বত-উৎসারিত প্রেমানুভূতি দিয়ে আমি নিঃশব্দে প্রকৃতির কাছে আত্মনিবেদন করলাম। এবার কিন্তু শাক্রোর রূপ নিয়ে প্রকৃতিই আমাকে আমার ভাবাবেগের জন্য ব্যঙ্গ করে উঠল। প্রকৃতির বিরুদ্ধে, শাক্রোর বিরুদ্ধে, সমগ্র জীবনের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ তীব্রতর হয়ে উঠত যদি না সেই মুহূর্তে কার এদিকে আসার পায়ের শব্দ আমার চিন্তায় বাধা না দিত।

'রাগ করো না,' অনুতপ্ত সুরে আমার কাঁধে মৃদু করস্পর্শ বুলিয়ে বলে শাক্রো। 'তুমি কি প্রার্থনা করছিলে? আমি জানি না, কারণ আমি নিজে কখনো প্রার্থনা করি না।'

দুরন্ত ছেলের মত ভয়ে ভয়ে কথা বলে ও। উত্তেজনা সত্ত্বেও আমার দৃষ্টি এড়াল না ওর মুখের কি বেচারী ভাব। ঘাবড়ে গিয়ে কেমন বিকৃত হয়ে গেছে ওর মুখখানা, দেখলে হাসি পায়।

'তোমার ব্যাপারে আর আমি কোন কথা বলব না, সত্যি বলছি, কখ্খনো নয়।' খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে শাক্রো। 'আমি জানি, তুমি ঠাণ্ডা গোছের মানুষ. নিজে প্রাণপণে খাট অথচ খাটবার জন্য আমাকে জুলুম কর না। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি, 'কেন? নিশ্চয়ই তুমি বোকা, একটা ভেড়া!'

আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার এই হল তার ধরন! মার্জনা চাইবারও এই হল তার পদ্ধতি! এ রকম সান্ত্বনা ও ত্রুটিস্বীকারের পর তাকে মার্জনা করা ছাড়া আমার আর কি-ই বা করণীয় থাকতে পারে। সে মার্জনা শুধু অতীতের জন্যে নয়, ভবিষ্যতের জন্যেও!

আধঘণ্টা বাদেই ও গভীর ঘুমে ডুবে গেছে। পাশে বসে আমি ওর দিকে চেয়ে থাকি। যত বড় শক্তিমানই হোক না মানুষ, ঘুমের মধ্যে প্রত্যেককেই বড় অসহায়, বড় দুর্বল দেখায়। কিন্তু শাক্রোকে দেখাচ্ছিল একেবারে অসহায় জীব। তার পুরু আধ-খোলা ঠোঁটদুটো. তার বাঁকা ভ্রূযুগল—সব মিলে মুখের উপর ছিল একটি শিশুর ছবি, ভয় ও বিস্ময়ে ভরা। ধীরে নিয়মিত নিঃশ্বাস নিচ্ছে, মাঝে মাঝে আবার ছটফট করে উঠছে, আর বিড় বিড় করে জর্জিয়ান ভাষায় কি যেন আউড়ে যাচ্ছে। মনে হল, সে ভাষা অনুনয়ের। আমাদের চার-

পাশে নিবিড় নিস্তব্ধতা, এর মধ্যে মনে যেন কিসের আশংকা জাগে। সে মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী হলে পাগল হয়ে যায় মানুষ। একে অবিচ্ছিন্ন প্রশান্তি, তায় নিরন্ধ্র নীরবতা! এতটুকু শব্দ নেই, চঞ্চলতার যেটুকু প্রকাশ তা ছায়ায়, গতি ও শব্দ—সব একাকার হয়ে গেছে।

জলের মৃদু ছল ছল শব্দ আমাদের কানে আসছে না। ঝোপে ঘেরা একটা খাদের মধ্যে শুয়ে আছি আমরা। অশ্মীভূত কোন দানবের দাড়িভরা মুখের মত সে খাদটা। আমি শাক্রোর দিকে তাকিয়েই আছি আর ভাবছি, 'ও আমার সহযাত্রী। ওকে ফেলে আমি চলে যেতে পারি। কিন্তু ওর হাত থেকে বা ওরই দলের হাত থেকে আমি রেহাই পাব কি করে! তারা যে সংখ্যায় অগুণতি। ও আমার জীবনের সঙ্গী, মৃত্যুর দ্বারদেশে না পৌঁছানো পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হবে না।'

পাঁচ

ফিওদসিয়ায় এসে আমরা একেবারে নিরাশ হলাম। এখানকার যা-কিছু কাজ সব বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। একদিকে তুর্কি, গ্রীক ও জর্জিয়ান ভবঘুরেদের মধ্যে, আর একদিকে পল্‌টাভা ও স্মলেন্‌স্ক-থেকে-আসা রুশ চাষীদের মধ্যে, আমাদের আগেই এসে পৌঁছেছে তারা। এরই মধ্যে কাজের তালাসে আমাদের মত লোক এসে হাজির হয়েছে প্রায় চারশোর উপর। আর আমাদেরি মত তাদের থাকতে হচ্ছে বন্দরের কর্মময় জীবনের নীরব দর্শক হয়ে। শহর ও শহরতলীতে দলে দলে দুস্থ রুক্ষ ও চিন্তাজর্জর চাষীদের অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। ভবঘুরের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়, তারা ঘুর ঘুর করছে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত।

এরা প্রথম আমাদের দুস্থ চাষী মনে করেছিল, যা পারে হাতড়ে নেবে। শাক্রোকে আমি যে ওভারকোটটা কিনে দিয়েছিলাম, তার পিছন দিকটা ছিঁড়ে নিলে একদিন। আমার কাঁধের ঝোলাটাও নিলে ছিনিয়ে। কিছু আলাপ-আলোচনার পর আমাদের সঙ্গে তাদের বুদ্ধিগত ও সামাজিক আত্মীয়তা স্বীকার করে নিলে তারা— যা কিছু নিয়েছিল,

সব ফেরত দিয়ে দিল। ভবঘুরের দল হয়ত শয়তান, কিন্তু তাদেরও সম্মানবোধ আছে।

যখন দেখলাম কোন কাজ জুটছে না আমাদের, আর আমাদের না নিয়েই বন্দর তৈরির কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে, তখন মনের দুঃখে আমরা কার্চের দিকে রওনা হলাম।

বন্ধু কথা রেখেছে। আমাকে আর কোনমতেই ও বিব্রত করেনি কিন্তু কি ভীষণ শুকিয়ে গেছে ও! মুখখানা হয়েছে পোড়াকাঠের মত। অন্য কাউকে খেতে দেখলে নেকড়ের মত দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে, আর নিজে কি খেতে চায় তার অদ্ভুত ফিরিস্তি দিয়ে আমার বিভীষিকার সৃষ্টি করে। ইদানীং আবার ও মেয়েমানুষ সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছে। গোড়ায় গোড়ায় কখনো সখনো বলত, হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এ বিষয়ের আলোচনা ওর অনেক বেড়ে গেছে। কথায় কথায় ওর মুখে ফুটে ওঠে কামুকতার হাসি, প্রাচ্যদেশের মানুষের মধ্যে যেমনটা দেখা যায়। অবস্থা শেষকালে এমন দাঁড়াল যে, বয়স বা চেহারা যা-ই হোক না কেন, মেয়েছেলে দেখলে ওর মুখ থেকে তার রূপ ও দেহগঠন সম্পর্কে কতকগুলি অশ্লীল মন্তব্য বেরিয়ে আসে। মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনায় ওর মুখ এমন আলগা, যৌন বিষয়ে ও এমন গভীর জ্ঞান প্রকাশ করে, আর কথাগুলি বলে একেবারে সোজাসুজি, কোন ঢাকাঢুকির ধার ধারে না। ওর আলোচনা শুনলেই আমার মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে। একবার আমি ওর কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করলাম যে, জীব হিসেবে নারী ওর থেকে হেয় নয়। আমার কথায় শুধু যে ওর মনে ঘা লাগল, তাই নয়, ভীষণ রেগে প্রতিবাদ করে উঠল, আমি নাকি তাকে ব্যক্তিগত অপমান করছি। অতএব আমি আমার যুক্তিতর্ক স্থগিত রাখলাম। আগে আর একবার ওর ভাল করে খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিই।

কার্চে যাওয়ার সোজাপথ ধরবার জন্যে আমরা সমুদ্রতীর ছেড়ে স্টেপির ভিতর দিয়ে পাড়ি মারলাম। আমার থলেতে একটা দেড়সেরী বার্লির রুটি ছাড়া আর কিছুই নেই। আমার শেষ পাঁচ কোপেক দিয়ে এক তাতারের কাছ থেকে কিনে নিয়েছি এটা। এই ভীষণ অবস্থার

মধ্যে শেষ পর্যন্ত যখন কার্চে এসে পে'ৗছই, পা আর চলে না, কাজ খোঁজা ত দূরের কথা। পথের ধারে শাক্রো ভিক্ষা করতে চেষ্টা করেছে, কিছু সুরাহা হয় নি। সবাই কাটা কথায় এক জবাব দিয়েছে—তোমাদের মত কত আছে।

এ মন্তব্য একেবারে নিষ্ঠুর সত্য। এই দুর্বৎসরে খাবার সন্ধানে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভয়াবহ তাদের সংখ্যা। দুস্থ শীর্ণ চাষীর দল সর্বত্র দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তিন থেকে বিশ জন, কোন দলে বা আরও বেশি। কারুর আবার কোলে শিশু, কেউ বা বাচ্চার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। শিশুগুলির দেহগুলি প্রায় স্বচ্ছ বললেই চলে, নীলাভ ত্বকের নীচে রক্তের ধারা বইছে না—যা বইছে তা হল ঘন ও দূষিত অন্য কিসের ধারা। গায়ের মাংস সব ক্ষয়ে গেছে, আর তলা থেকে ছোট ছোট হাড়গুলো এমনভাবে খোঁচা মেরে বেরিয়েছে, ওদের অবস্থা যেন উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করছে। ওদের চেহারা দেখলে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে, একটা অসহ্য বেদনা যেন নিরন্তর অন্তরে আঘাত করতে থাকে।

এই ক্ষুধার্ত নগ্ন শীর্ণকায় শিশুগুলি কাঁদেও না, চারপাশে প্যাঁট প্যাঁট করে তাকায়, ফসল কাটা হয় নি এমন বাগান বা ক্ষেত দেখতে পেলে লোভে ওদের চোখগুলি জ্বলে ওঠে। একবার বড়দের দিকে তাকায়, যেন কৈফিয়ৎ দাবি করছে—কেন এনেছ আমাকে এই পৃথিবীতে?

মাঝে মাঝে ওরা চলেছে একটা গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে, অস্থি-সার বুড়ী চালাচ্ছে সেটাকে। ছোট ছোট মাথাগুলি তুলে উঁকি মেরে ম্লান চোখে তাকিয়ে দেখে—এ কোন্ নতুন দেশে এসেছে ওরা। চুপ করে থাকে কিন্তু সেই নীরবতার মধ্যেই ফুটে ওঠে তাদের অন্তরের বেদনা। অস্থিসার রুক্ষমূর্তি ঘোড়াটা কোনমতে নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছে। আর মাথা ঝেঁকে ঘাড়ের লম্বা লোমগুলি এপাশ থেকে ওপাশে ফেলছে।

গাড়ীর পিছনে পিছনে, কখনো বা চার পাশ ঘিরে চলছে বড়র দল, মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর, হাত দুটো অসহায়ভাবে ঝুলে পড়েছে

দুপাশে। তাদের ক্ষীণ চোখের শূন্য দৃষ্টিতে ক্ষুধার উগ্র জ্বালা পর্যন্ত নেই। সে দৃষ্টির বিষণ্ণতা বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু তারও ভাষা আছে। দুর্দৈবের বশে গৃহ থেকে বিতাড়িত এই চাষীদের মিছিল চলেছে অজ্ঞাত দেশের ভিতর দিয়ে, ধীরে, নীরবে শান্ত পদক্ষেপে। ভাগ্যবানদের শান্তি পাছে ব্যাহত হয়—এই ওদের ভয়। এমন মিছিল একটার পর একটা, অনেক আমাদের চোখে পড়ছে। ওদের দেখে প্রতিবারেই আমার মনে হয়, এ যেন শবদেহবিহীন শবযাত্রা।

কখনও কখনও ওরা এসে পিছন থেকে আমাদের ধরে ফেলেছে, কখনও বা আমরা গিয়েছি ওদের পার হয়ে। ভীত শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করেছে আমাদের—গ্রাম আর কত দূরে! আমাদের জবাব শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে ওরা, বোবার মত তাকিয়ে থেকেছে আমাদের দিকে। দয়ার পাত্র হিসেবে এই দুর্জয় প্রতিযোগীদের দারুণ ঘৃণা করে আমার সহযাত্রী বন্ধু।

পথ চলার নিদারুণ কষ্ট এবং উৎকট খাদ্যাভাব সত্ত্বেও শাক্রোর প্রাণশক্তি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। উপবাসী চাষীদের মধ্যে যে শীর্ণতা ও ক্ষুধার্ত মূর্তি উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে শাক্রোর চেহারায় সে ছাপ পড়েনি। দূর থেকে যেই সে ওদের দেখতে পায় দূর্ দূর্ করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওই আবার আসছে হতভাগার দল! কেন ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা! ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কোন কি কাজ নেই ওদের! এতবড় রুশ দেশেও শানাচ্ছে না,—বুঝি না ওরা কি চায়? রুশগুলো সত্যি আহাম্মক।'

আমি বুঝিয়ে দিই, 'আহাম্মক' রুশেরা কেন ক্রিমিয়ায় এসেছে। শাক্রো অবিশ্বাসের সুরে মাথা নেড়ে বলে, 'বুঝি না বাপু! যত সব বাজে কথা! এ রকম আহাম্মকী কাণ্ড আমাদের জর্জিয়ায় কখনও ঘটে নি।'

আগেই বলেছি, কার্চে এসে যখন পেঁাছলাম—তখন যেমন ক্ষুধার্ত তেমনি অবসাদগ্রস্ত। তার উপর দেরিও হয়ে গেছে। রাতটা কাটাতে হল একটা পুলের নীচে। বন্দরের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডকে সংযোগ করেছে সে সেতু। লুকিয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনা করলাম, কারণ

শোনা গেল যে আমরা এসে পেঁছনোর ঠিক আগেই বাউণ্ডুলেগুলোকে শহর থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের হাতে পড়তে পারি —এই ভয়ে রীতিমত বিব্রত বোধ করলাম। তা ছাড়া, শাক্রোর পাশ-পোর্টটাই ভুয়ো। ধরা যদি পড়ে তাহলে অনেক জালে জড়িয়ে পড়তে হবে।

সারা রাত সমুদ্রের ভাঙা ঢেউয়ের ছিটে এসে লেগেছে আমাদের গায়ে। ভোরবেলা যখন সেই পুলের নীচে থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম, সারা গা তখন ভিজে, ঠাণ্ডায় জমে গেছে শরীর। সারাদিন সাগরকূলে ঘুরে বেড়ালাম। রোজগার হল একটিমাত্র দশ কোপেকের রূপোর চাকতি। পুরোহিতের স্ত্রীর তরমুজের বোঝাটা বাজার থেকে তাঁর বাড়ী পেঁছে দিয়ে মজুরি পেয়েছি।

আমরা যাব তামান, মাঝে একটা সরু সমুদ্রের ফালি—কিন্তু অনেক মিনতি জানানো সত্ত্বেও কোন মাঝি আমাদের পার করে দিলে না। বেকার ভবঘুরে গোছের লোকের উপর সবাই খড়্গহস্ত। আমরা এসে পেঁছবার কিছু আগেই নাকি একদল এখানে হাঙ্গামা হুজ্জৎ করে গেছে। আমাদেরও ধরে নিয়েছে সেই দলের লোক বলে। খুব অন্যায় করেছে—মনে হয় না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, সারা দুনিয়ার উপর রাগে গর্ গর্ করছি—কেন আমি সব কিছুতেই ব্যর্থ হলাম! এবার মনে মনে এক দুঃসাহসিক ফন্দি আঁটি, রাত বাড়তেই কাজে লেগে যাই।

ছয়

অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই শাক্রো আর আমি চুপে চুপে এসে হাজির হলাম যেখানে কাস্টম হাউজের পাহারাদার-নৌকোগুলো বাঁধা আছে। তিনখানি নৌকো লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা। তীরে পাথুরের দেয়ালে বসানো লোহার কড়ার সঙ্গে আটকানো সে শিকল। ঘুরঘুট্টি অন্ধ-কার। ঝোড়ো হাওয়ায় নৌকোগুলো একটা আর একটার গায়ে ধাক্কা

মারছে, কড়্ কড়্ করে বাজছে লোহার শিকলগুলো। একে অন্ধকার, তায় এই উৎকট শব্দ—দেওয়াল থেকে লোহার কড়াগুলো আলগা করে দিতে আমার অসুবিধা হল না।

ঠিক আমাদের মাথার উপর পাহারাদার টহল দিয়ে ফিরছে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে সুর ভেঁজে শিস দিচ্ছে। সে কাছাকাছি আসতেই আমি থেমে যাই যদিও এত সাবধান হওয়ার কোন দরকার নেই। তার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়, যেখানে ঢেউয়ের ফিরতি টানে যে-কোন মুহূর্তে পা হড়কে ভেসে যেতে পারে মানুষ, সেখানে গলা জলে কেউ বসে থাকবে। তা ছাড়া, শিকলের শব্দ এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয় নি, বাতাসের দোলায় অনবরত বেজে চলেছে। শাক্রো ত এরি মধ্যে নৌকোর তলায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে, বিড় বিড় করে কি বকছে ও, ঢেউয়ের শব্দে আমার তা কানে আসে না। শেষ পর্যন্ত কড়াটা হাতে নিয়ে নিই। সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের এক ধাক্কায় নৌকোটা ছিটকে চলে যায় বিশ হাত দূরে। শিকলটা হাতে নিয়ে নৌকোর পাশে পাশে একটুকাল সাঁতার কাটতে হয় আমাকে, তারপর কোনরকমে নৌকোটার গা বেয়ে উপরে উঠি। পাটাতন থেকে দুখানা তক্তা ভেঙে নিয়ে তাই দিয়ে বৈঠার কাজ চালাই—তর্ তর্ করে এগিয়ে চলে নৌকো।

মাথার উপর জমাট মেঘ, নীচে গর্জমান সাগর। শাক্রো গলুইয়ের ধারে, নৌকোটা প্রতিমুহূর্তে এমন তোলাপাড়া করছে যে, মাঝে মাঝেই ও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পরের মুহূর্তেই ও উঠছে আমার প্রায় মাথার উপর, আর মরিয়া হয়ে চীৎকার করে উঠছে, আমার বুকের উপর লাফিয়ে পড়ে আর কি! আমি ওকে চীৎকার করতে বারণ করি। বলি, আমার মতন করে গুরায় পা দুটো আটকে বসে থাক। আমার ভয় হয়, ওর চেঁচামেচির ফলে ধরা পড়ে যাব। শাক্রো কথা শোনে, এমন চুপ করে যায়, ও যে আছে তা আমি জানতে পারি অন্ধকারের মধ্যে ওর সাদা মুখের আভাসে। সারাক্ষণ কিন্তু হালটা ও হাতে ধরে রয়েছে, জায়গা যে বদল করে নেবো, নড়বার সাহস নেই।

মাঝে মাঝেই আমি ওকে বলে দিই কি করে হাল সামলাতে হবে, ওর বুঝতে একটুও দেরি হয় না, এমন চতুরতার সঙ্গে সব কিছু করে

যায় যেন দেখলে মনে হবে, ও জন্ম-মাঝি। যে তক্তাদুটো দিয়ে আমি বৈঠার কাজ চালাচ্ছি তাতে কাজের কাজ হচ্ছে না কিছুই, শুধু হাত-দুটোয় ফোস্কা পড়ে গেল। নৌকো এগোচ্ছে দমকা হাওয়ার জোরে। কোন্ দিকে চলেছি, তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই, যেখানেই হোক ওপারে পেঁাছতে পারলেই হল। কার্চের আলোগুলো এখন দেখা যাচ্ছে, দিক্‌ভ্রম হবার আশঙ্কা কম। শোঁ শোঁ শব্দে ঢেউগুলো এসে ক্রুদ্ধ আঘাত হানছে নৌকোর উপর, যত এগোচ্ছি, ঢেউগুলোর গর্জন ও উদ্দামতা ততই বাড়ছে। এমন একটা শব্দ কানে আসছে, মন প্রাণ যেন মুগ্ধ হয়ে যায়। হাওয়ার ভরে নৌকো ছুটেছে জোরে, শেষ পর্যন্ত দিক ঠিক করে চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। একবার ডুবে যাই কোন খাদে, পরের মুহূর্তে এক লাফে উঠে পড়ি যেন পাহাড়ের চূড়ায়। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, মেঘগুলো আসে আরো নীচে নেমে, শহরের আলো আর দেখা যায় না।

আমাদের অবস্থা দুঃসহ হয়ে ওঠে। মনে হয়, এই মত্ত ঢেউগুলোর কোথাও সীমা শেষ নেই। আর কিছু দেখা যায় না। অন্ধকার চিরে এই বিরাটকায় ঢেউগুলোই সোজা ছুটে আসছে আমাদের নৌকোর দিকে। একটা ঝাপটায় আমার এক হাতের তক্তাখানি ভেসে গেল, আর একখানি ছিটকে পড়ল নৌকোর মধ্যে। দুহাতে দুপাশের কানা আঁকড়ে ধরি। যখনই নৌকোটা ঠেলে উপরে ওঠে, পাগলের মত চেঁচিয়ে ওঠে শাক্রো। আর আমি—আমি নিজেও অন্ধকারের মধ্যে চারপাশে কানে তালা-লাগানো ঢেউগুলোর ক্রুদ্ধ গর্জনে অসহায় এবং নিরুপায় বোধ করি। ভয়ে রক্ত জমে আসে, জীবন বিস্বাদ মনে হয়, একবার তাকিয়ে দেখি চারপাশে একটানা বিভীষিকা। ঢেউ, ঢেউ, আর ঢেউ! মাথায় সাদা মুকুট পরে আছড়ে ভেঙে পড়ছে, ছিটকে দিচ্ছে নোনা জলের ধারা। আর মাথার উপর কুটিল কালো মেঘ, সেগুলো ঢেউয়েরই প্রতিমূর্তি।

শুধু একটি কথা মনে জাগল আমার, আমি অনুভব করলাম, চার পাশে যা-কিছু চলছে তা আরো ভয়াল, আরও মহিমময় হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু কি খেয়ালে রুদ্র তাঁর আপন শক্তি সংহত করে রেখেছেন,

আমার মন তাতে তৃপ্ত হচ্ছে না। মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু সে যে নিরপেক্ষ বিধানে সকলকে সমান স্তরে নেমে আসতে হয়, তার রুক্ষ নির্দয় মূর্তির মধ্যেও যদি সৌন্দর্য ফুটে ওঠে—সব দুঃখ দূর হয়ে যায় তাতে। আগুনে পুড়ে মরা, আর একটা থলির মধ্যে দম বন্ধ হয়ে মরা—এই দুই মৃত্যুর মধ্যে আমাকে যদি বেছে নিতে হয়, আমি আগুনে পুড়েই মরতে চাইব। মৃত্যুর স্বরূপ অন্তত কিছুটা তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

'একটা পাল উড়িয়ে দিলে হয় না', উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে শাক্রো।

'কোথায় পাব পাল?'

'আমার ওভারকোটটা লাগাও।'

'ছুঁড়ে দাও আমার কাছে সেটাকে, কিন্তু সাবধান, তাই করতে গিয়ে যেন হালটাকে জলে ডুবিয়ে দিও না।'

শাক্রো শান্তভাবে ছুঁড়ে দেয় সেটা আমার দিকে, বলে, 'ধর।'

উবু হয়ে পড়ে পাটাতন থেকে আর একখানি তক্তা খুলে ফেলি। তার একটা দিক ঢুকিয়ে দিই সেই ওভারকোটের একটা হাতের মধ্যে, তারপর তক্তাটা খাড়া করে দিয়ে পা দিয়ে চেপে ধরি সেটাকে। কোটের আর একটা হাতা ধরতে যাচ্ছি, এমন সময় একটা অঘটন ঘটে গেল। হঠাৎ লাফিয়ে উঁচু হয়ে উলটে গেল নৌকোটা। জলের মধ্যে পড়ে গেলাম। আমার এক হাতে তখন ধরা রয়েছে ওভারকোটটা, আর এক-হাতে আছে নৌকোয় বাঁধা একটা দড়ি। মাথার উপর দিয়ে গর্জন করে পাক খেয়ে চলেছে ঢেউগুলো, মুখের মধ্যে ঢুকে গেল খানিকটা বিস্বাদ নোনতা জল। নাক মুখ কান—সব জলে ভরে উঠল।

ঢেউগুলি আমাকে নিয়ে লুফালুফি খেলছে, আর আমি প্রাণপণে দড়িটা আঁকড়ে ধরে আছি। বারে বারে ডুবে যাই, যেই মাথা তুলি, নৌকোর গায়ে ঠুকে যায় মাথা।

শেষ পর্যন্ত কোটটাকে ছুঁড়ে দিতে পারলাম নৌকোর পিঠে, তার-পর হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে নিজে সেখানে উঠবার চেষ্টা করতে লাগ-লাম। বহুবারের চেষ্টায় বেয়ে উঠে দুপাশে পা ঝুলিয়ে সওয়ার হয়ে বসে গেলাম নৌকোর পিঠে। তখন দেখলাম শাক্রো কোথায়। নৌকোর উলটো দিকে সে ভাসছে, যে দড়িটা আমি সবে ছেড়ে দিয়েছি সেটাই

দুহাতে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। বুঝলাম নৌকোর চার পাশে ঘোরানো আছে দড়িটা। নৌকোর গায়ে আঁটা লোহার কড়ার সঙ্গে ঢোকানো।

'বেঁচে আছ!' আমি চীৎকার করে উঠলাম। হঠাৎ সেই মুহূর্তেই শাক্রো উৎক্ষিপ্ত হল শূন্যে, তারপর সেও এসে গেল নৌকোর উপর। আমি জড়িয়ে ধরলাম তাকে। তারপর মুখোমুখি রইলাম দুজনে, উলটানো নৌকোর পিঠে। দড়িটা হাতে ধরে এমনভাবে বসলাম যেন লাগাম ধরে ঘোড়া চালাচ্ছি। কিন্তু এইভাবে এখানে বসে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। যে-কোন মুহূর্তে একটা ঢেউ এসে সহজেই আমাদের আসনচ্যুত করতে পারে। আমার দুটো হাঁটু আঁকড়ে ধরে আমারই বুকে মাথা লুটিয়ে বসে থাকে শাক্রো। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে, তার দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকির শব্দ শুনতে পাই। একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। উলটানো নৌকোর পিঠটা এমন পিছল যেন কেউ মাখন মাখিয়ে দিয়েছে তাতে। শাক্রোকে বলি, আবার জলে নেমে পড়তে। নৌকোর এক ধারে দড়ি ধরে থাকবে ও, আর একধারে থাকব আমি।

আমার বুকের মধ্যে মাথা দিয়ে বারে বারে ধাক্কা মারতে থাকে—এই শাক্রোর জবাব। উদ্দাম নৃত্যরত ঢেউগুলি অনবরত আমাদের গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আসনস্থ আর থাকা যাচ্ছে না : দড়িটা কেটে বসছে আমার পায়ে। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল বিরাট-কায় ঢেউ। একবার পর্বতচূড়ার মত মাথা উঁচু করে উঠছে, পর মুহূর্তে গর্জন করে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

শাক্রোকে যা উপদেশ দিয়েছিলাম, এবার হুকুমের সুরে তার পুনরাবৃত্তি করি। ও শুধু আরো জোরে জোরে আমার বুকে মাথা ঠুকতে থাকে। একটুও সময় নষ্ট করবার উপায় নেই। ধীরে এবং অনেক কষ্টে আমার গা থেকে ওর হাত দুটো ছাড়িয়ে নিই, তারপর ঠেলে জলে ফেলতে চেষ্টা করি ওকে। ওর হাত দুটো দিয়ে দড়িটা ধরিয়ে দিতে চাই। এবার যা ঘটল, সেই বিভীষিকাময়ী রাত্রির সব কিছুর চেয়েও সেটা ভয়াবহ।

'আমাকে ডুবিয়ে দিচ্ছ?' আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বিড়-বিড় করে ও বলে ওঠে।

সত্যি ভয় লাগে আমার। তার প্রশ্নটাই ভয়ঙ্কর, আরও ভয় তার বলার সুরে। নিয়তির হাতে যেন সে নিজেকে একেবারে সঁপে দিয়েছে। ভয়াবহ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবার আর কোন পথই যেন তার নেই। কিন্তু সব চেয়ে ভয়াল তার চোখের দৃষ্টি। সিক্ত পাংশু মৃতকল্প মুখমন্ডলে একজোড়া চোখ ড্যাব্ ড্যাব্ করে আমার দিকে চেয়ে আছে।

'খুব শক্ত করে ধর আমাকে' আমি চেঁচিয়ে উঠি। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেই তাকে জলে টেনে নামাই। শক্ত করে ধরে নিই দড়িটা। জলে নামতেই হঠাৎ পায়ে কি ঠেকে যায়। সেই মুহূর্তে কিছু বুঝে উঠতে পারি না। তারপর ভাবতে শুরু করি, চকিতে মনের মধ্যে একটা চিন্তা খেলে যায়, আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই, সমস্ত হারানো শক্তি ফিরে আসে।

'মাটি!' আমি চীৎকার করে উঠি।

দেশ-আবিষ্কারের অভিযানে যাঁরা গিয়েছেন, নতুন দেশের আভাস পেয়ে তাঁরা যখন চেঁচিয়ে উঠতেন, তার মধ্যে হয়ত অনুভূতির গভীরতা ছিল অনেক বেশি, কিন্তু এত জোরে কেউ কখনও চেঁচিয়েছে কি-না, জানি না। শাক্রো উল্লাসে হৈহৈ করে উঠল। দুজনেই তাড়াতাড়ি জলের মধ্যে পড়ে গেলাম। কিন্তু হায় হায়! এ কি হতাশা! ঢেউয়ের মধ্যে বুক পর্যন্ত ডুবে গেছে, কিন্তু মাটির সন্ধান মিলছে না। ঢেউগুলো এখন আর তত উঁচু নয়, তাদের শক্তিও অনেক কম। ধীরে ধীরে আমাদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। ভাগ্য ভাল, নৌকো-টাকে ছেড়ে দিই নি। যে দড়িটা জলের মধ্যে আত্মরক্ষার সংগ্রামে আমাদের সহায় হয়েছিল সেটাকে তখনো ধরে আছি। দুজনেই সামনের দিকে সাবধানে এগোতে থাকি। নৌকোটা সোজা করে নিয়েছি। এবার দড়ি ধরে টেনে আনি।

শাক্রো কি বিড়বিড় করে আর হেসে ওঠে। আমি ভয়ে ভয়ে এবার চারপাশে দেখে নিই। চতুর্দিক তখনো অন্ধকার, আমাদের পিছনে ও ডাইনে তরঙ্গ গর্জন যেন বেড়ে চলেছে। অথচ সামনে এবং বাঁয়ে সে গর্জন ক্ষীয়মান। বাঁ দিকে সরে গেলাম। পায়ের তলায় শক্ত

বালি আর অজস্র গর্ত। সব সময় পায়ে মাটি ঠেকে না। তাই এক হাতে নৌকো ধরে পা চালিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। মাঝে মাঝে হাঁটু জল ঠেকে। জল যেখানে গভীর লাগে, শাক্রো চেঁচামেচি করে ওঠে। আমি ভয়ে কাঁপতে থাকি। সহসা সামনে চেয়ে দেখি একটা আলো। বেঁচে গেলাম তাহলে!

শাক্রো প্রাণপণে চেঁচিয়ে ওঠে, কিন্তু আমি ভুলতে পারি না যে নৌকোটা আমাদের নয়। সঙ্গে সঙ্গেই সে কথা মনে করিয়ে দিই। শাক্রো চুপ করে যায়, কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই শুনতে পাই সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি কিন্তু সব বৃথা। জল ক্রমে অগভীর হয়ে আসে, হাঁটুতে এসে ঠেকে, তারপর গোড়ালিতে। এবার শুকনো ডাঙা। নৌকোটাকে অনেক দূর পর্যন্ত টেনে এনেছিলাম। আর ক্ষমতায় কুলোয় না। ফেলে দিয়ে চলে আসি। আমাদের পথে একটা কালো কাঠ পড়ে, সেটাকে লাফিয়ে পার হই, তারপর যেখানে পদক্ষেপ করি—খালিপায়ে সেখানকার ঘাসগুলো কাঁটার মত ফোটে। এ কি নিষ্ঠুর অভ্যর্থনা করছে আমাদের মাটি! তবু তা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ নেই, আগুনের দিকে দৌড়ই। প্রায় এক মাইল পথ ; কিন্তু নিশীথের অন্ধকারে এত দূরেও তার দীপ্তি ম্লান হয় নি—যেন সহাস্য অভ্যর্থনা জানাচ্ছে আমাদের।

সাত

ঝাঁকড়া লোমওয়ালা তিনটা কুকুর হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে আমাদের পিছনে ছুটে আসতে থাকে। শাক্রো এতক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, এবার সে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমি ভিজে ওভারকোটটা কুকুরগুলির দিকে ছুঁড়ে দিই, তারপর নীচু হয়ে দেখি একটা লাঠি বা ইট-পাথর কুড়িয়ে পাওয়া যায় কি-না। শক্ত কিছুই মেলে না। কেবল খোঁচা খোঁচা ঘাসে হাতদুটো জ্বালা করে। কুকুরগুলো আক্রমণ চালিয়ে যায়, নিরুপায় হয়ে আমি মুখে আঙুল পুরে যত জোরে পারি শিস দিতে থাকি। কুকুরগুলো পিছু

হটে, আর সঙ্গে সঙ্গে কানে আসে পায়ের শব্দ আর গলার আওয়াজ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

কয়েক মিনিট পরেই একটা আগুনের চারপাশ ঘিরে চারজন মেষ-পালকের সাহচর্যে আমরা আসীন। তাদের গায় লম্বা ভেড়ার চামড়ার ওভারকোট।

অশেষ মনোযোগ সহকারে এবং সংশয়ের দৃষ্টি নিয়ে ওরা আমাদের নিরীক্ষণ করে। আমি যখন আমাদের কাহিনী বলে চলি, সারাক্ষণ কোন শব্দ করে না কেউ।

দুজন মাটিতে বসে ধূমপান করে, মুখ থেকে কুণ্ডলী পাকানো মেঘ বার করে দেয় থেকে থেকে। তৃতীয় ব্যক্তিটি দীর্ঘকায়, এক মুখ কালো দাড়ি, মাথায় তার উঁচু ফার্-এর টুপি, একটা মস্ত গিঁঠেল লাঠির উপর ভর করে আমাদের পিছনে সে দাঁড়িয়ে থাকে। চতুর্থ ব্যক্তিটি বয়সে তরুণ, মাথার চুলগুলি ঝক্ঝকে। শাক্রোর ভিজে কাপড় ছাড়ায় সে সহায়তা করতে থাকে। শাক্রো কিন্তু তখনও ফুঁপিয়ে চলেছে। যে তিনজন বসে আছে তাদেরও প্রত্যেকের পাশে একটা করে বিরাট ডাণ্ডা, আকার দেখলেই প্রাণে ভয় জাগে।

বিশ হাত দূরেই তেপান্তরের মাঠের উপর কি যেন আবরণ পড়েছে—ধূসর ও দোলায়মান। দেখলে মনে হয়, যেন বসন্তের তুষার, সবে গলতে আরম্ভ করেছে। গভীর মনসংযোগ করে নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, এই দোদুল্যমান ধূমরাশি আর কিছুই নয়, ঘন সন্নি-বিষ্ট কয়েক হাজার মেষ, অন্ধকার রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় একাকার হয়ে আছে। মাঝে মাঝে করুণ ও ভীত স্বরে ডেকে ওঠে।

আগুনের ধারে ওভারকোটটা শুকিয়ে নিই আর আমাদের কাহিনী যথাযথভাবে বিবৃত করি মেষপালকদের কাছে ; এমন কি, কিভাবে নৌকো সংগ্রহ করেছিলাম, তাও খোলাখুলিই বর্ণনা করি।

'নৌকোটা এখন কোথায় ?' আমার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে প্রশ্ন করে সেই রূঢ়দর্শন বর্ষীয়ান লোকটি।

আমি তাকে বলে দিই।

'যাও মিখেল, দেখে আসো গিয়ে।'

কালো দাড়িওয়ালা মিখেল লাঠিগাছটা কাঁধে ফেলে সাগরকূলের দিকে এগিয়ে যায়।

আমার ওভারকোটটা শুকিয়ে গেছে। নগ্ন গাত্রে শাক্রো সেটা পরতে উদ্যত হলে বৃদ্ধ লোকটি বলে ওঠে, 'যাও, আগে দৌড়ে শরীর-টাকে গরম করে এসো। খুব জোরে আগুনের চারপাশে ছুটবে। চলে যাও।'

প্রথমটা শাক্রো বুঝতে পারে না, তারপর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায় এবং আগুনের চারপাশে নিজস্ব এক নৃত্য শুরু করে দেয়। প্রথমে সে একটা বলের মত আগুনের উপর দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে লাফা-লাফি করতে থাকে। তারপর বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে—একই জায়গায়। তারও পরে শাক্রো দুহাত ছুঁড়ে প্রাণপণে চেঁচাতে শুরু করে দেয়। সে এক হাস্যকর দৃশ্য। দুজন মেষপালক ত গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। হাসতে হাসতে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে প্রায়, আর বৃদ্ধ লোকটি ভাবলেশহীন গুরুগম্ভীর দৃষ্টিতে নাচের তালে তালে হাত-তালি দেবার চেষ্টা করে, ঠিক পেরে ওঠে না। নৃত্যরত শাক্রোর প্রতিটি গতি ও ভঙ্গি সে নিরীক্ষণ করে আর মাথা নেড়ে নেড়ে কাংস্যকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হে হে, বহুৎ আচ্ছা, হে হে!'

শাক্রোর সারা গায়ে আলো পড়ায় ওর নাচের বৈচিত্র্য স্পষ্ট দেখা যায়। এক মুহূর্তে সে সাপের মত সারা শরীরটা বাঁকিয়ে ফেলে, পরক্ষণেই একপায়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। তারপরেই এমন দ্রুত-পদক্ষেপে শুরু করে দেয় যে, চোখের দৃষ্টি তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। আগুনের আলোয় তার নগ্ন দেহ জ্বল জ্বল করতে থাকে। বড় বড় স্বেদবিন্দু তার গা বেয়ে পড়বার সময় আগুনের লাল আলোয় রক্তবিন্দু বলে প্রতিভাত হয়।

এতক্ষণে তিনজন মেষপালকই হাততালি দিতে শুরু করে দিয়েছে। আর শীতে কাঁপা শরীরটাকে আগুনে গরম করে নিতে নিতে আমি ভাবতে থাকি যে, আমাদের অভিযানের কাহিনী কুপার ও জুলে ভার্নার-ভক্ত পাঠকদেরও তৃপ্তি দিতে পারে। প্রথমত, নৌকাডুবি, তারপর এল অতিথিবৎসল স্থানীয় আদিম অধিবাসীর দল। পরি-

শেষে আগুন ঘিরে উদ্দাম বন্য নৃত্যও চলল। এই সব ভাবতেই হঠাৎ অস্বস্তি জেগে ওঠে—প্রতিটি অভিযান কাহিনীর মুখ্য বিষয়, অর্থাৎ তার পরিসমাপ্তির কথা চিন্তা করে।

নাচা শেষ হলে শাক্রো আগুনের ধারে বসে পড়ে সারা গায়ে ওভারকোটটা মুড়ি দিয়ে। ইতিমধ্যেই সে খেতে শুরু করে দেয়, আর আমার দিকে দুটো কালো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। এমনভাবে জ্বল্ জ্বল্ করে চোখদুটো, আমার তা মোটেই ভাল লাগে না। মাটির মধ্যে লাঠি পুঁতে তার সঙ্গে ঝোলানো ভিজে কাপড়গুলো আগুনে শুকোতে থাকে। মেষপালকেরা আমাকেও কিছু রুটিমাংস দিয়েছিল।

মিখেইল ফিরে এসে বিনা বাক্যব্যয়ে বৃদ্ধের পাশে বসে পড়ে।

'খবর ভাল?' জিজ্ঞাসা করে বুড়ো।

'নৌকোটা খুঁজে পেয়েছি।'

'ভেসে যাবে না?'

'না।'

মেষপালকদের দল আবার আমাদের নিরীক্ষণ করতে থাকে।

বিশেষ কারুকে উদ্দেশ না করেই মিখেইল বলে ওঠে, 'তাহলে ওদের কি ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে, না, সোজা কাস্টম হাউসে অফিসারদের কাছে যাব?'

তা হলেই ত দফা গয়া, আমি মনে মনে ভাবি।

মিখেইলের কথার কেউ জবাব করে না। শাক্রো নীরবে শান্ত ভাবে খেয়ে চলে।

'ফাঁড়িতেও নিয়ে যাওয়া চলে, অথবা কাস্টম হাউসেও নিয়ে যাওয়া চলে। দুটো ব্যবস্থাই সমান।' একটু চুপ করে থেকে মন্তব্য করেন বৃদ্ধ।

'কাস্টম হাউস থেকে নৌকো চুরি করেছে ওরা, এমন শিক্ষা হওয়া উচিত যে, ভবিষ্যতে যেন কখনো আর তা না করে।'

'আমাদের কথাটা শুনো, বুড়ো কত্তা,' আমি বলতে শুরু করি।

আমাকে বাধা দিয়ে আমার প্রতিবাদ কানে না তুলেই বুড়ো বলে চলে, 'তা বলে নৌকো চুরি করা ওদের মোটেই উচিত হয় নি। এখন

যদি ওদের শাস্তির ব্যবস্থা না হয় তাহলে ভবিষ্যতে হয় ত আরও বড় অপরাধ করতে পারে।'

আমাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলতে থাকে বৃদ্ধ, আর তার কথা শেষ হতেই তার দলের সবাই সায় দিয়ে মাথা নাড়তে থাকে, 'নিশ্চয়। যদি কেউ চুরি করে, ধরা পড়লে শাস্তি তাকে নিতেই হবে—মিখেইল, নৌকোটার খবর কি? সেটা আছে সেখানে?'

'হ্যাঁ, আমি দেখে এসেছি।'

'ঢেউয়ে ভেসে যায় নি, বলতে পার?'

'না, যায় নি।'

'ভালো। নৌকো যেখানে আছে সেখানেই থাক। কাল মাঝিরা যখন কার্চ যাবে, তারা নিয়ে যাবে সেটা। একটা খালি নৌকো নিয়ে যেতে তাদের আপত্তি হবে না। কেমন? শোন, তোমরা বলতে চাও, তোমরা একটুও ভয় পাওনি? একেবারেই না? যত সব বাউণ্ডুলে কাণ্ড! আর আধ মাইল যদি এগিয়ে যেতে তবে এতক্ষণ সমুদ্রের তলায়। আর ঢেউ যদি ফের টেনে নিয়ে যেত কি করতে তাহলে? একজোড়া কুড়ুলের মত টুপ করে সমুদ্রের তলায় ডুবে যেতে নিশ্চয়ই। আর খুঁজে পাওয়া যেত না তোমাদের।'

কথা শেষ করে বৃদ্ধ আমার দিকে তাকায়, ঠোঁটে তার নিদারুণ শ্লেষের মৃদু হাসি।

'কিহে কথা বলছ না কেন ছোকরা?' বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে।

তার মন্তব্যে এমন মেজাজ খিঁচড়ে যায় আমার, আমি ধরে নিই, ও আমাকে টিটকিরি করছে। জবাবে আমার তাই কড়া কথা বেরিয়ে আসে।

'তোমার কথাগুলো শুনছিলাম।'

'তা হলে কি বলবে এখন?'

'কিছু না।'

'এমন মেজাজ গরম কেন? বুড়ো মানুষের উপর এমন মেজাজ দেখানো কি উচিত?'

আমি চুপ করে যাই। মনে মনে স্বীকার করি, কাজটা সত্যি উচিত হয় নি।

'আর কিছু খাবে?' বৃদ্ধ মেষপালক জিজ্ঞাসা করে।

'না। আর খেতে পারছি না।'

'বেশ। না ইচ্ছে করে খেয়ো না। কিন্তু পথে খাওয়ার জন্য যদি এক টুকরো রুটি নিতে চাও—'

আনন্দে আমি কাঁপতে থাকি, কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করি না।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, পথে খাওয়ার জন্যে কিছু নেওয়ার ইচ্ছে আছে।' শান্তভাবে জবাব দিই আমি।

'শোন হে ছোকরারা, এদের দুজনকে কিছু রুটি আর খানিকটা করে মাংস দিয়ে দাও। আর কিছু যদি থাকে, তাও দিয়ে দিও।'

'এদের কি আমরা ছেড়ে দেবো?' মিখেইল জিজ্ঞাসা করে।

অপর দুজন মেষপালক বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থাকে।

'ওরা কি করবে এখানে?'

'আমরা ওদের ফাঁড়িতে বা কাস্টম হাউসে নিয়ে যাব না?' হতাশার সুরে প্রশ্ন করে মিখেইল।

আগুনের পাশে বসে শাক্রো চঞ্চল হয়ে ওঠে। উৎসুক দৃষ্টিতে ওভারকোটের ভিতর থেকে মাথাটা বার করে দেয়। তবুও তাকে শান্ত বলেই মনে হয়।

'ফাঁড়িতে গিয়ে কি করবে ওরা? সেখানে ত এখন কিছু করবার নেই। হয় ত পরে ওরা সেখানে যেতে পারে।'

'নৌকোটার কি হবে তাহলে?' মিখেইল চেপে ধরে।

'কি আবার হবে নৌকোর?' ফের প্রশ্ন করে বৃদ্ধ। 'তুমি না বললে, নৌকোটা যেখানে আছে, ঠিক আছে!'

'হ্যাঁ, তা ঠিকই আছে,' মিখেইল জবাব দেয়।

'তা হলে তা-ই থাক না। সকালের দিকে জন্ ওটা বেয়ে বন্দরে পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে আর কেউ কার্চে নিয়ে যেতে পারবে এটা। নৌকোটা সম্বন্ধে আমাদের আর কি-ই বা করবার আছে।'

বৃদ্ধের মুখের দিকে আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখি, কিন্তু তার সে রোদে-পোড়া ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত ভাবলেশবিহীন মুখমণ্ডলে তার মনো-

ভাবের একটুও ছাপ খুঁজে পাই না। শুধু নৃত্যমান আগুনের শিখাগুলি সেই মুখের উপর জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে।

'কোন গোলমালে না পড়লেই বাঁচোয়া,' মিখেইল যেন গা ছেড়ে দেয়।

'গোলমাল কিছুই হবে না, যদি তুমি কথা না বল। ফাঁড়িতে যদি খবর পেঁাচয় তা হলে আমাদেরও মুশকিল, ওদেরও। আমাদের নিজেদের কাজ আছে, আর ওদেরও পথ চলা আছে। তোমরা কি অনেক দূর যাবে? আবার প্রশ্ন করে বৃদ্ধ, যদিও আমি আগেই বলেছি, আমরা তিফলি যাব।

'সে ত এখন অনেক দূর। ফাঁড়ি যদি ওদের আটকে ফেলে, তাহলে ওরা তিফলি যাবে কবে? ওদেব চলে যেতে দাও, বুঝলে?'

বক্তব্যের শেষ শক্ত করে মুখ চেপে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় বৃদ্ধ, আর পাকা দাড়িতে আঙুল চালাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে সবাই বলে ওঠে, 'বেশ, যেতে দাও ওদের।'

'বেশ গো ভালমানষের পো, রওনা হয়ে যাও, ভগবান তোমাদের সহায় হোন।'

বৃদ্ধের বলার ভঙ্গীর মধ্যে ভাবখানা এই—যেন সটান বিদায় করে দিচ্ছে ওদের। আবার বলে, 'নৌকো নিয়ে কোন ভাবনা করো না, ওটা যথাস্থানে পেঁাছে যাবে, সে দায়িত্ব আমাদের।'

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দাদু', মাথার টুপি খুলে নিয়ে আমি বললাম।

'আমাকে ধন্যবাদ দেবার কি হল?'

'ধন্যবাদ একবার নয়, একশোবার।' আমি কৃতজ্ঞতায় ফেটে পড়ি।

'আরে কি বিপদ এই লোকটাকে নিয়ে! ধন্যবাদ দিচ্ছ কিসের জন্য? আমি বলছি, ভগবান তোমার ভাল করুন, আর লোকটা কি-না ধন্যবাদ দিচ্ছে আমাকে! তোমাদের কি ভয় হয়েছিল যে আমি শয়তানের কাছে তোমাদিগকে পাঠিয়ে দেব, এ্যাঁ?'

'অন্যায় করেছিলাম, তাই ভয় পেয়েছিলাম,' আমি জবাব করি।

'ওঃ!' বৃদ্ধ ভুরু দুটো কপালে তোলে, 'তাই বলে লোককে অন্যায়ের পথে আরও এগিয়ে দেবো কেন? আমি, বরং আমি যে পথে চলি, সে

পথে যেতে চাইলে হাত ধরে নিয়ে যেতে পারি। আবার যদি কোনদিন দেখা হয় বন্ধুভাবেই দেখা হবে। সুযোগ পেলেই পরস্পরকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। আচ্ছা বিদায়!'

ভেড়ার চামড়ার ঝাকড়া টুপিটা মাথা থেকে খুলে সে আমাদের অভিবাদন জানাল, তার সংগীরাও।

আনাপার পথ জিজ্ঞাসা করে নিয়ে আমরা রওনা হলাম। শাক্রো কিন্তু সব কিছুতেই হেসে উঠছিল।

আট

'হাসছ কেন?' আমি প্রশ্ন করি।

বৃদ্ধ মেষপালক আর তার জীবনদর্শন আমাকে আনন্দ দিয়েছে, মুগ্ধ করেছে। সকালের মুক্ত হাওয়ায় আমি তাজা বোধ করছি। সে হাওয়া এসে সোজা লাগছে আমার মুখে। দেখছি আকাশের মেঘ কেটে যাচ্ছে, দিনের আলো ফুটতে দেরি নেই। মন ভরে উঠছে আমার। একটু পরেই নির্মল নীলাকাশে প্রভাতের সূর্য ফুটে উঠবে। উজ্জ্বল আনন্দময় দিনটির প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠি।

শাক্রো কিন্তু আমার দিকে পিট পিট করে তাকায়। শেষ পর্যন্ত আর এক দফা হাসিতে ফেটে পড়ে। তার হাসির উচ্ছলতা আমার মুখেও মৃদু হাসির আভাস জাগায়। মেষপালকদের সংগে আগুনের ধারে যে কয়ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েছি, যে সুস্বাদু রুটি ও মাংস পর্যাপ্ত আহার করেছি তার ফলে আমাদের পথের ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। হাড়ে একটু ব্যথা এখনো লাগছে, পথ চলতে চলতে তাও কেটে যাবে।

'আরে, তুমি এত হাসছ কিসের জন্যে? এখনও বেঁচে আছ—এই আনন্দে? বেঁচে আছ, অথচ খিদে নেই, না?'

শাক্রো মাথা নাড়ে, আমার বুকে একটা আলতো টোকা দিয়ে কেমন এক মুখভংগী করে, তারপর আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। হাসি থামলে পর ভাঙা রুশ ভাষায় বলে, 'দেখছ না কেন হাসি আসছে আমার?'

শোন বলছি। তুমি কি জান, আমাদের যদি ফাঁড়িদারের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হত, কি বলতাম আমি তা হলে? জান না ত?—আমি বলতাম, তুমি আমাকে ডুবিয়ে মারতে চাইছিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে শুরু করে দিতাম। ফলে আমার উপর ওদের দয়া হত, জেলে পুরত না আমাকে। বুঝলে ব্যাপারটা?'

আমি ভাবলাম, ও নিশ্চয়ই রহস্য করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও আমাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়লে যে ও যা বলছে—সত্যিই বলছে। এমন স্পষ্টভাবে ও আমার মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিল যে, ওর এই অকপট স্বার্থপরতার প্রকাশে আমি রাগ করতে পারলাম না। গভীর বেদনায় মন ভরে গেল আমার—ওর জন্যে ত বটেই, আমার জন্যেও। যে-লোকটা প্রাণখোলা সরল হাসি হেসে স্পষ্ট বলতে পারে, সে খুন করতে চায়, তার জন্যে মনে করুণা ছাড়া আর কি-ই বা আসে! কি করাই বা যায় তাকে নিয়ে! যে এর মধ্যে নিজের বুদ্ধির বিকাশ জাহির করে, রস ও আনন্দের খোরাক পায়!

আমি সাগ্রহে ওর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিই, বোঝাবার চেষ্টা করি, তার এই মতলব কি হেয়। ও সোজাসুজি জবাব করে, তার স্বার্থের দিকে আমারও দৃষ্টি নেই। কারণ, সে যে মিথ্যা পাসপোর্ট নিয়ে চলছে এবং যে কোন সময় বিপদে পড়তে পারে—একথা আমার মনে নেই। হঠাৎ আমার মনে এক ক্রূর মতলব খেলে যায়।

'রসো, তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর যে আমি তোমাকে ডুবিয়ে মারতে চেয়ে ছিলাম?"

'না। যখন তুমি আমাকে জলে ঠেলে দিচ্ছিলে তখন তাই মনে হয়েছিল। তারপর তুমি নিজেও যখন নেমে এলে, আমার সংশয় কেটে গেল।'

'বাঁচালে। এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।'

'না, আমাকে ধন্যবাদ দেবার তোমার কিছু নেই। আমারই বরং তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আগুনের ধারে যখন এসে বসি, তখন দুজনেই শীতে কাঁপছি। ওভারকোটটা তোমার, তবুও তুমি সেটা নিজে নিলে না। কষ্ট করে শুকিয়ে সেটা আমাকে দিয়ে দিলে।

নিজে এমনিই রয়ে গেলে। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি লোক ভাল, সে আমি বুঝতে পেরেছি। তিফলি যখন পেঁছবো, এর প্রতিদান আমি দেবো। বাবার কাছে তোমাকে নিয়ে গিয়ে বলব, 'এই লোকটাকে খাইয়ে পরিয়ে যত্ন করা উচিত, আর আমাকে রেখে দেওয়া উচিত আস্তাবলে খচ্চরদের সঙ্গে।' তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকবে। বাগানের মালি হবে। প্রচুর মদ দেবো তোমাকে। আর যা খেতে চাও। মজায় দিন কাটাবে, আমার খাবার ও মদে বখ্‌রাও পাবে তুমি।'

তিফলিতে গিয়ে আমার নতুন আস্তানায় যে নতুন জীবন ও আমার জন্যে গড়ে তুলবে তার লোভনীয় বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বেশ খানিকক্ষণ বলে চলে।

ও বলছে আর আমি ভাবছি, নতুন নীতি ও নতুন আশা যাদের মনে তাদের কি অশেষ দুঃখ—জীবনের পথ তাদের একাই চলতে হয়, হয় ত বিপথেও চলে যায় ; যে সব সহযাত্রীর সঙ্গে দেখা হয় পথে তারা কেউ এদের আপন জন নয়, বুঝতে পারে না। এদের নিঃসঙ্গ জীবন দুর্বহ বোঝা হয়ে পড়ে। অসহায়ভাবে এধার ওধার ছুটাছুটি করে মরে, যেন ভাল বীজ কেউ বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে, মাটিতে পড়ছে বটে, কিন্তু সরস জমি জুটছে না।

দিনের আলো ফুটে ওঠে। দূরে গোলাপী সোনার মত সমুদ্র হাসছে।

'আমার ঘুম পাচ্ছে', বলে শাক্রো।

থেমে পড়ি। শাক্রো শুয়ে পড়ে একটা খাদের মধ্যে, সমুদ্রের ধারের শুকনো বালিতে ঝোড়ো হাওয়ায় এমনি খাদ গড়ে উঠেছে। ওভারকোটটায় সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে মাথা পর্যন্ত চেপে শুয়ে পড়ে সাক্রো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে, ওর পাশে চুপ করে আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকি, যেন স্বপ্ন দেখছিঃ

কি বিরাট এর জীবন, প্রবল আলোড়নে ভরা! ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে গর্জন করে তীরে ভেঙে পড়ছে, তারপর তির্‌ তির্‌ করে জল এগিয়ে আসছে বালির উপর অস্পষ্ট আওয়াজে যে জল পান করে নিচ্ছে বেলাভূমি। সামনের ঢেউগুলো মাথায় ফেনার মুকুট পরে বিরাট গর্জনে

আছড়ে পড়ছে, তারপর যাচ্ছে ফিরে। পিছনের ঢেউগুলো আসছিল ওদের সামাল দিতে, আবার পিছন থেকে ঠেলে এগিয়ে দেয়। ফেনায় আর উচ্ছ্রিত জলকণায় একাকার হয়ে সবগুলো আবার ছোটে তীরের দিকে। সেখানে আবার আঘাত করে অধিকারের সীমানা বাড়িয়ে নেবার জন্যে। তাদের সংগ্রামের অন্ত নেই। দিগন্ত থেকে বেলাভূমি, মাঝে অনন্ত জলরাশি। নমনীয় অথচ দুর্ধর্ষ ঢেউগুলো ছুটছে, অবিরত ছুটে চলেছে, এক লক্ষ্যে ঐক্যবন্ধ হয়ে একাঙ্গ হয়ে গিয়েছে। ঢেউয়ের মাথায় সূর্যালোকের দীপ্তি ক্রমে বেড়ে ওঠে, দূর দিগন্তে সেগুলো রক্তের মত লাল দেখায়। এই বিরাট জলরাশির বুকে অহর্নিশি যে আলোড়ন তাতে এক বিন্দুও বিপথে যায় না। যেন কোন সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে এরা চলছে ধ্বনির তালে তালে দুর্ধর্ষ আঘাতের পর আঘাত দিয়ে, অবিলম্বেই সেই উদ্দেশ্য সাধন করবে। সামনের ঢেউ-গুলোর সৌন্দর্যে কি বলিষ্ঠতা, নিদারুণ আঘাতে নিঃশব্দ বালুবেলাকে যেভাবে পীড়ন করছে, মন তাতে অভিভূত হয়ে যায়, আর সাগরের পরি-পূর্ণ রূপ কি শান্ত, কি সংহত, বিরাট শক্তিতে অবিরত এগিয়ে চলেছে! এবার রামধনুর সব রঙগুলো প্রতিফলিত হয়, নিজের শক্তিতে ও সৌন্দর্যে, গর্বে ও আনন্দে হেসে ওঠে।

একটা স্থলখণ্ডের পাশ দিয়ে জল কেটে একটা বড় স্টীমার ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। অশান্ত সমুদ্রের উপর দিয়ে আপন মহিমায় দুলে দুলে চলেছে। ঢেউগুলো মাথা তুলে ভয় দেখাতে এলেও ঠেলে ফেলে দিচ্ছে তাদের। অন্য সময় হলে এই শক্তিমান গতিশীল মহিমময় জাহাজখানি হয় ত আমার মনে মানুষের সৃষ্টিশীল মনীষার কথা জাগিয়ে দিত—অশান্ত প্রকৃতিকে পদানত করতে পারে যে মনীষা, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার পাশেই রয়েছে প্রকৃতির এক বন্য অভিব্যক্তি—মানুষের রূপ নিয়ে।

নয়

আমরা তিফলি জেলার ভিতর দিয়ে চলেছি। শাক্রোর চেহারা ও পোশাক যেমন ছেঁড়া তেমনি নোংরা, বর্ণনার বাইরে চলে গেছে। মেজাজ

তার যা হয়েছে, খেঁকী কুকুরকেও ছাড়িয়ে যায়। অথচ প্রচুর খেতে পাচ্ছে ও এখন, এ অঞ্চলে কাজ পাওয়া সহজ কি-না। ও নিজে কিন্তু কোন কাজই ভাল করতে পারে না। একবার ও ঝাড়াই কলে সামান্য একটা কাজ পেয়েছিল। কলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলে খড়গুলোকে পাশে ঠেলে দিতে হবে, এই ছিল ওর কাজ। মাত্র এক বেলা কাজ করেই ও কেটে পড়ল—ওর হাতের চেটোয় নাকি জ্বালা করছিল। আর একবার আমার সঙ্গে ও আরো জন কয়েকের সঙ্গে গাছ উপড়ানোর কাজ শুরু করেছিল, কিন্তু খন্তাটা দিয়ে নিজের ঘাড়ই চুলকে গেল।

আমরা এগোচ্ছি ধীরে, দুদিন কাজ করি, তৃতীয় দিন হাঁটি। যা-কিছু হাতে পায় শাক্রো একাই খেয়ে নেয়, আর তার রাক্ষুসে খিদে মিটোতেই সব পয়সা ফুরিয়ে যায় আমার। নতুন কাপড় আর তাকে কিনে দিতে পারি না। ওর ছেঁড়া পোশাকগুলোয় মজার তালি পড়েছে—যেমন তাদের নানান রং, তেমনি নানা আকার। অনেক বোঝাবার চেষ্টা করি ওকে, মদের দোকানে ঢুকো না, আর পছন্দসই মদ না-ই বা খেলে! কিন্তু আমার কথা শোনার কোন দায় পড়েনি ওর।

তবুও অনেক কষ্টে ওর কাছে গোপন রেখে চার রুব্‌ল্‌ জমিয়ে ফেলেছিলাম, ওকে নতুন পোশাক কিনে দেবার জন্যে। একদিন একটা গাঁয়ে থেমেছি, আমার ঝুলি থেকে পয়সাগুলি চুরি করে সন্ধ্যার সময় মাতাল হয়ে ফিরে এল আমি যে বাগানে কাজ করছিলাম সেখানে। সঙ্গে দেখি এক মোটা গেঁয়ো মেয়েমানুষ। সে আমাকে এসে বলে, 'কিগো ভণ্ড মশায়!'

সম্বোধনে তাজ্জব ব'নে গেলাম আমি। বললাম, 'তার মানে?'

'তুমি জোয়ান পুরুষকে মেয়েদের সঙ্গে পিরীত করতে দেবে না, তুমি ভণ্ড ছাড়া কি?' বেশ দেমাকের সঙ্গেই জবাব দেয় মেয়েটা। 'আইনে যা চলে, লোকে যা করে, তুমি তা ঠেকাবার কে হে? পোড়া-কপাল!'

পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সমর্থন করে শাক্রো মাথা নাড়তে থাকে। এত মাতাল হয়েছে ও, পা দুটো ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে। এক বার সামনে ঝুঁকছে, এবং পরমুহূর্তেই যাচ্ছে পিছিয়ে। নীচের ঠোঁটটা অসহায়ের

মত ঝুলে পড়েছে। ঘোলাটে চোখে আমার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে থাকে।

'তাকিয়ে দেখছ কি? ওর টাকাগুলি এখন ভালয় ভালয় দিয়ে দাও', চেঁচিয়ে ওঠে বেহায়া মেয়েটা।

'টাকা, কিসের টাকা?' আমি আকাশ থেকে পড়ি।

'এখনি দিয়ে দাও বলছি, নইলে আমি এখনি তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাব। ওদেশায় ওর কাছ থেকে দেড়শ' রুব্‌ল্ ধার করেছিলে না?'

কি উপায়? মাতালটা সত্যি পারে থানায় গিয়ে নালিশ করতে; বাউণ্ডুলে ভবঘুরেদের উপর থানাওয়ালারা এমন কড়া যে এখনি দুজনকে হাজতে পুরে দেবে। আমাকে যদি আটকায় তাহলে অবস্থা যা হবে, কেবল আমার নয়, শাক্রোরও, ভগবানই শুধু জানেন। একমাত্র উপায় হল মেয়েটাকে ধাপ্পা দিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া। ব্যাপারটা অবশ্য শক্ত নয়।

তিন বোতল ভদকা শেষ করেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল মেয়েটা, মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল—তরমুজ ক্ষেতের উপর। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে অচৈতন্য। তারপর শাক্রোকেও ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। পরদিন ভোর হতে না হতেই রওনা দিলাম সেই গাঁ ছেড়ে, তরমুজ ক্ষেতের মধ্যে মোটা মেয়েটা তখনও ঘুমে অচৈতন্য।

এত মাতলামির পরে শাক্রোকে মোটেই সুস্থ দেখাচ্ছিল না। মুখটা ফুলো, এখানে ওখানে দাগ পড়েছে। আস্তে আস্তে চলছে শাক্রো, আর যখন তখন থুথু ফেলছে, মাঝে মাঝে ফেলছে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস। গল্প জুড়বার চেষ্টা করলাম ওর সঙ্গে, কিন্তু সাড়াই দিলে না। শুধু উস্কখুস্ক মাথাটা ক্লান্ত ঘোড়ার মত দু-একবার নাড়লে।

ভ্যাপসা গরম পড়েছে। ভিজে মাটির জলো বাষ্পে ভর্তি, আর মাটির উপর ঘন মোটা ঘাসের প্রাচুর্য, লম্বায় সেগুলো আমাদের মাথা পর্যন্ত উঠেছে। আর আমাদের চারপাশে পড়ে আছে মখমল-মসৃণ ঘাসে ঢাকা মাঠের মত শান্ত নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। গরম হাওয়ার মধ্যে কড়া ঘেসো গন্ধ মাথা ঘুলিয়ে দেয়।

পথ বাঁচাবার জন্যে একটা সরু রাস্তা ধরলাম। সেখানে ছোট ছোট লাল সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কুণ্ডলী পাকাচ্ছে আমাদের পায়ের নীচে।

ডান দিকে দিগন্তরেখায় দেখা যাচ্ছে পর্বতমালা, তাদের চূড়ায় লেগেছে মেঘ, সূর্যের আলোয় রূপোর মত জ্বলছে সেগুলি। দাগুয়েস্তান পর্বতশ্রেণী।

এই শান্ত নিস্তব্ধতা মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, স্বপ্নাবেশ এনে দেয় মনে। আমাদের পিছন দিক থেকে ঘন কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে ধীরে ধীরে সমগ্র আকাশ গ্রাস করতে এগিয়ে আসে। আমাদের পিছন দিক যখন অন্ধকার হয়ে গেছে, সামনের দিকটা তখনো পরিষ্কার। শুধু পেঁজা তুলোর মত কয়েক টুকরো মেঘ মনের আনন্দে ছুটোছুটি করছে। জমাট মেঘ, ক্রমে আরো অন্ধকার হয়ে আসে, আচমকা ছেয়ে ফেলে সমগ্র আকাশ। দূর থেকে যেন বজ্রনিনাদ শোনা যেতে থাকে, আর সেই রাগের গড় গড় শব্দ, প্রতিমুহূর্তে আরো কাছে মনে হয়। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু হয়ে যায়, ঘাসের উপর পড়ছে সেগুলো, তবুও শব্দ শুনলে মনে হয় যেন কাঁসা পিটিয়ে কেউ আওয়াজ কবছে। আশ্রয় নেবার মত এতটুকু জায়গা কোথাও নেই। ঘন আঁধারে ঘিরেছে চারদিক। ঘাসের উপর বৃষ্টির শব্দ আরো জোরালো হয়ে ওঠে, তবুও সেই শব্দে কেমন একটা ভয়ের ভাব। একটা বাজ পড়ার আওয়াজ হল, বিদ্যুতের ঝিলিকে সারাটা আকাশ উঠল কেঁপে, সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে পর্বত শিখরে রৌপ্যালোকিত মেঘখণ্ডগুলো হারিয়ে গেল। বৃষ্টি এতক্ষণে মুষলধারে পড়তে শুরু করেছে, বিরাট প্রান্তরের মাথার উপর একটার পর একটা বজ্রগর্জন আমাদের অবিরত ভয় দেখাতে লাগল। বাতাসের ধাক্কায় ও বৃষ্টির চাপে লম্বা ঘাসগুলো এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে—যেন ভেঙে পড়েছে ক্লান্তিতে। সবকিছু যেন কাঁপছে, দুলে উঠছে চারদিক, ঝোড়ো মেঘ কেটে ফাটিয়ে দিচ্ছে বিদ্যুৎ চমক। সে আলোয় মুহূর্তের জন্যে চোখে পড়ছে সুদূরের পর্বত চূড়াগুলো, বিদ্যুতের নীল আলোয় ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে উঠছে। আবার বিদ্যুৎ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও সরে যাচ্ছে, অন্ধকারের গহীন গহ্বরে গিয়ে ঢুকছে। বাতাসের মধ্যে কিসের গুড় গুড় আওয়াজ, ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে অনুরণিত হয়ে উঠছে। ক্রোধান্ধ নীচু মেঘগুলো অগ্নিশুদ্ধ হয়ে নিচ্ছে, এই পৃথিবীর ধূলি মাটি ও ক্লেদ থেকে পবিত্র করে নিচ্ছে নিজেকে।

মেঘের ক্রোধগর্জনে আশঙ্কায় কাঁপছে ধরণী। শাক্রোও কাঁপছে, আর ত্রস্ত কুকুরের মত ঘ্যান ঘ্যান করছে। আমি কিন্তু আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছি, স্টেপি অঞ্চলে ঝড়ের এই বিরাট ও ভয়াবহ রূপ আমাকে সাধারণ ক্ষুদ্র জীবন থেকে অনেক উঁচুতে তুলে নিয়ে গেছে। এই অপার্থিব প্রলয় মূর্তি আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিল, জাগিয়ে দিল আমার অন্তরের বীর পুরুষকে, বন্যতা হিংস্রতার ঐক্যতানে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

সেই ঐক্যতানে যোগ দেওয়ার জন্য আমার মন আকুল হয়ে উঠল। অন্ধকার ভেদ করে ঘনায়মান মেঘের আবরণ ছিন্ন করে যে রহস্যময় শক্তি, তারই মধ্যে আমার অন্তর উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে যে আনন্দ-আবেশে, তাকে যে কোন ভাবে মূর্ত করতে চাই। যে নীল আলোয় আকাশ আলোকিত, আমার মনও তাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আমার মনের কামনা, প্রকৃতির এই মহিমময় রূপে আমার অন্তরের উল্লাস—কেমন করে প্রকাশ করব! গান গেয়ে ওঠলাম, গলা ছেড়ে যত জোরে পারি। মেঘ ডেকে উঠল, আকাশে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেল। ঘাসের মধ্যে কি যেন কানাকানি, আর আমি গাইছি গান, প্রকৃতির আনন্দময় সত্তার সঙ্গে অন্তরের আত্মীয়তা বোধ করছি। পাগল হয়ে গেলাম না কি! ক্ষতি কি। আমার নিজের ছাড়া, আর কারুরই যখন তাতে ক্ষতি নেই, সে অপরাধ নিশ্চয়ই মার্জনীয়, এই স্টেপি অঞ্চলে যে বিরাট শক্তি ও সৌন্দর্যের জীবন্ত রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যাবার গভীর বাসনা জেগেছে আমার মনে। সমুদ্রে চলছে তুফান, স্টেপিতে চলছে ঝড়বৃষ্টি, প্রকৃতির এর চেয়ে মহিমময় কোন মূর্তির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তাই প্রাণ খুলে চীৎকার করতে লাগলাম, মনে দৃঢ় বিশ্বাস, এতে কারুর কোন অসুবিধার সৃষ্টি করছি না। আমাকে সমালোচনা করবার জন্য ধারে কাছে কেউ নেই। কিন্তু হঠাৎ বুঝতে পারলাম, পা-দুটোকে কে যেন ধরে ফেলেছে, অসহায়ের মত জলের মধ্যে পড়ে গেলাম।

শাক্রো আমার মুখের দিকে গভীর রোষদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'তুমি কি পাগল? না ত কি? না? বেশ, তা হলে চুপ কর।

চেঁচিও না! গলাটা কেটে দেবো তোমার! বুঝলে?'

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, কি ক্ষতি করেছি আমি তার।

'কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছ! মেঘ ডাকছে, ভগবান কথা বলছেন, আর তুমি কি না চেঁচাচ্ছ! বলি, কি ভাবছ বল দেখি?'

'যে কোন গান গাইবার অধিকার আমার আছে,' আমি জবাব করলাম, 'ঠিক তোমার যেমন আছে ঠিক তেমনি।'

'কিন্তু আমি এ চাই না!'

'বেশ, তুমি গান গেয়ো না', আমি জবাব করলাম।

'আর তুমিও গেয়ো না,' হুকুম করল শাক্রো।

'আমি গান গাইবই।'

'থামো বলছি! তুমি ভেবেছ কি?' শাক্রো রেগেমেগে বলে চলে। 'তুমি কে হে রাজপুত্তুর? চাল নেই চুলো নেই, বাড়ীঘর বাপ-মা কেউ নেই কোথাও; না আছে কোন আত্মীয় পরিজন, না আছে নিজের বলতে একটুকরো জমি। ভারী! নিজেকে বুঝি কেউ-কেটা ভেবেছ! কেউ-কেটা যদি কেউ হয় ত সে আমি! আমার সব কিছু আছে!'

রাগে জোরে জোরে বুক চাপড়াতে থাকে শাক্রো।

'আমি রাজপুত্র, আর তুমি? এক্কেবারে কিচ্ছু নও! তুমি হয় ত বলবে, আমি হেন্ আমি তেন্, আর কেউ কি বলবে তা? সারা মুল্লুকে আমায় সবাই জানে। আমার কথা কাটবার চেষ্টা করো না। শুনছিস্? তুই ত আমার চাকর, তা ছাড়া আর কি? যা-কিছু করেছিস আমার জন্যে, দশগুণ দাম ধরে দেবো। আমাকে ঠিকমত মেনে চলবি। তুই বলিছিলি, ভগবান না কি আমাদের শিখিয়েছেন প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখে পরস্পরের সেবা করা, কিন্তু আমি তোকে প্রতিদান দেবো, কড়ায় গণ্ডায় ধরে দেবো।'

'আমাকে বিরক্ত করিস কেন? তত্ত্বকথা শুনিয়ে আর ভয় দেখিয়ে কি সুরাহা হয় তোর? তুই কি চাস আমি তোর মত হব? ছি ছি! সে হবে না। তোর মত আমাকে করতে পারবিনে। যাঃ যাঃ!'

শাক্রো বকে চলেছে, অদ্ভুত শব্দ করছে ঠোঁটে, ভোস ভোস করে

দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছে। এবার চুপ করে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে বিস্ময়ে হা করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সমগ্র যাত্রাপথে যতকিছু অসন্তোষ, যত বিরাগ, যত বিরক্তি জমা হয়েছিল, সব যেন ঢেলে দিতে চাইছে। মাঝে মাঝে তর্জনী দিয়ে আমার বুকে খোঁচা মারছে, ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে—যেন ভাল করে আমাকে বুঝিয়ে দিতে চায়। যে কথাটা আমাকে ভাল করে বোঝাতে চায় তা বলার সময় ওর সারা দেহটাকে এনে ধাক্কা মারে আমার গায়, মাথার উপর ঝর ঝর করে বৃষ্টি পড়ছে, মেঘের গুরু গুরু আওয়াজ একবারও বন্ধ হয় নি। এর মধ্যে তার বক্তব্য শোনাবার জন্য শাক্রো গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। আমার যে অবস্থা তা হাসির, না, কান্নার, দুয়ের অদ্ভুত সংমিশ্রণ, তার স্বরূপ এত স্পষ্ট করে আর কোন দিন অনুভব করতে পারি নি। হো হো করে হেসে ফেললাম, দূরে সরে গিয়ে খানিকটা থুথু ফেললে শাক্রো।

দশ

তিফলির যত কাছে এগিয়ে আসছি শাক্রোর মন তত বিষণ্ণ হয়ে উঠছে, মেজাজ হয়ে পড়ছে তিরিক্ষে। মুখটা তার সরু হয়ে গেছে, কিন্তু সেই হাঁদা মুখে নতুন এক অভিব্যক্তি। ভ্ল্যাদিকাব্‌কাস্‌ পৌঁছবার ঠিক আগে আমরা একটা সিরকাসিয়ান গ্রামের ভিতর দিয়ে গেলাম। সেখানে কাজও পেলাম ভুট্টা ক্ষেতে।

সিরকাসিয়ানরা রুশ ভাষা সামান্যই বলে। সব সময় আমাদের নিয়ে তাদের হাসি টিটকিরি, তাদের দুর্বোধ্য ভাষায় আমাদের গালাগাল— এই সবে বিরক্ত হয়ে আমরা দুদিন বাদেই গ্রাম ছেড়ে রওনা দিলাম। ওদের বিরোধিতা যেমন বেড়ে উঠছিল, থাকার ভরসা পেলাম না তাতে।

গ্রামটাকে দশ মাইল পিছনে ফেলে এসেছি, এমন সময় জামার তলা থেকে শাক্রো বার করলে এক বাণ্ডিল ঘরে-বোনা মসলিন, আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বিজয়-উল্লাসে বলে ওঠে ঃ

'এবার আর তোমাকে কাজ করতে হবে না। এটা বিক্রি করলে

তিফলি পেঁছান পর্যন্ত যা-কিছু দরকার—সব কিনে নিতে পারব, বুঝলে?'

মেজাজ আগুন হয়ে গেল আমার। বাণ্ডিলটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দূর করে ছুঁড়ে ফেললাম, একবার তাকিয়ে দেখলাম পিছন দিকে।

সিরকাসিয়ানদের হেলাফেলা করা চলে না! অল্প আগে কসাকরা আমাদের একটা গল্প বলেছে ঃ

'একটা ভবঘুরে লোক সিরকাসিয়ান গ্রামে দিন কয়েক কাজ করে একটা লোহার চামচ নিয়ে চলে গিয়েছিল। সিরকাসিয়ানরা তার পিছু নিয়ে তল্লাসী করে ঠিক বার করে ফেললে চামচটা। ছুরি দিয়ে ফাঁসিয়ে দিলে তাকে, তার সেই ক্ষতের মধ্যে লোহার চামচটা ঢুকিয়ে দিয়ে নির্বিবাদে চলে গেল। আল্লার নামে পড়ে রইল জনশূন্য সেই স্টেপিতে। মুমূর্ষু অবস্থায় কয়জন কসাক তাকে দেখতে পেল। কাহিনীটি বললে। কসাকদের গ্রামে পেঁছবার আগেই মৃত্যু হল তার। সিরকাসিয়ানদের সম্বন্ধে কসাকরা আমাকে একাধিকবার সাবধান করে দিয়েছে। এই ধরনের আরো কাহিনী বলেছে। তাদের গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোন কারণ পাই নি আমি। শাক্রোকে সে সব কথা মনে করিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে সে আমার কথা শুনলে, তারপর হঠাৎ দাঁত খিঁচিয়ে চোখ পাকিয়ে আমাকে তেড়ে এল বুনো বেরালের মত। মিনিট পাঁচেক ধস্তাধস্তি চলল, তারপর রাগে চেঁচিয়ে উঠল শাক্রো, 'খুব হয়েছে, ঢের হয়েছে!'

ক্লান্ত হয়ে দুজনে বসে পড়লাম। নিঃশব্দে এ-ওর দিকে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। যেখানে লাল মসলিনটা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম, বারে বারে সেদিকে লুব্ধ দৃষ্টি ফেলে শাক্রো বলে উঠল ঃ

'কি নিয়ে লড়াই করছি আমরা! ছিঃ ছিঃ! আহাম্মকি না! আমি ত তোমার কাছ থেকে চুরি করি নি, করিছি? তাহলে তোমার মাথা ব্যথা কেন? তোমার এ দুঃখ দেখে কাপড়টা চুরি করলাম আমি, এত খাটতে হয় তোমাকে, অথচ আমি কোন সাহায্য করতে পারি না। ভাবলাম, চুরি করে তোমার সুবিধা করে দেবো। ধিক্!'

আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, চুরি করাটা কতবড় অন্যায় হয়েছে।

'মুখ সামলে কথা বল, দোহাই তোমার! একেবারে নিরেট কোথা-কার!' শাক্রোর কথা অবজ্ঞাভরা। সে বলে চলে, 'মানুষ যখন না-খেয়ে মরছে তখন চুরি করা ছাড়া তার আর উপায় কি? কিভাবে আমাদের দিন কাটছে!'

আমি চুপ করে আছি, ওকে আর রাগাতে সাহস হচ্ছে না। এই নিয়ে ও দ্বিতীয়বার চুরি করল। কিছুদিন আগে যখন কৃষ্ণসাগরের পারে ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন ও একটা জেলের ঘড়ি চুরি করেছিল। প্রায় ঘুষোঘুষির উপক্রম হয়েছিল আমার সঙ্গে।

'বেশ, চল তাহলে,' বললে শাক্রো। খানিকটা বিশ্রামের পর আবার শান্ত হয়ে বন্ধুভাবে পথ চলা শুরু করে দি।

এমনি করে নিজেদের টেনে নিয়ে চলি। প্রতিদিন ওর বিষণ্ণ ভাব বেড়ে যায়, ভুরুর নীচু থেকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকায় আমার দিকে।

দারিয়াল গিরি-পথ দিয়ে চলতে চলতে ও বলে ওঠে, 'আর দু-এক দিনেই তিফ্‌লি পেঁৗছে যাব। কি মজা!' জিভ দিয়ে চক্ চক্ করে, আনন্দে সারা মুখ ওর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'বাড়ী যখন পেঁৗছব, সবাই আমায় জিগ্যেস করবে, কোথায় ছিলাম এতদিন। আমি বলব, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু সবার আগে ভাল করে স্নান করব। তার পর খাওয়ার পালা। কত খাব! খালি একবার মাকে বলা, মা খিদে পেয়েছে! আর বাবাকে যখন বলব, কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর সব রাগ পড়ে যাবে। এই ভবঘুরে বাউণ্ডুলেগুলো লোক ভালো। ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই আমি একটা করে রুব্‌ল্ দিয়ে দেবো। তারপর নিয়ে যাব বীয়ারের দোকানে, খাইয়ে দেবো দু পাত্তর। তাদের বলব, আমিও একদিন এরকম বাউণ্ডুলে ছিলাম। তোমার সম্বন্ধে সব কথা বলব বাবাকে। আমি বলবঃ 'এই লোকটা বড়ভাইয়ের মত দেখেছে আমাকে। বক্তৃতা করেছে, মেরেছেও। ও-ই আমায় খাইয়েছে আর এখন তোমার ওকে

খাওয়াতেই হবে। পুরো একবছর তোমাকে খাওয়াতে বলব আমি। শুনছ হে ম্যাকসিম!'

ওর এই ধরনের কথাগুলো শুনতে আমার বেশ লাগছে। এই অবস্থায় এমন সরল এমন শিশুর মত মনে হয় ওকে, কথাগুলো শুনতে আরো ভাল লাগছে, কারণ সারা তিফ্‌লিতে আমার একজনও বন্ধু নেই। শীত এগিয়ে আসছে। এরি মধ্যে গোদাউব পাহাড়ে তুষারের ঝড়ের মুখে পড়ে গিয়েছিলাম একবার। শাক্রোর প্রতিশ্রুতিতে কিছুটা বিশ্বাস করছি। পা চালিয়ে চলতে লাগলাম, পৌঁছলাম এসে মেস্‌-কেট। আইবেরিয়ার প্রাচীন রাজধানী মেস্‌কেট। পরদিন তিফ্‌লি পৌঁছব এমন আশা হচ্ছে।

দূরে ককেসাসের রাজধানী দেখতে পাচ্ছি। মাইল চারেক দূরে দুটি উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে শুয়ে আছে সেই নগরী। যাত্রাশেষের ক্ষণ দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমার মনে আনন্দ, কিন্তু শাক্রো উদাসীন। দূরে শূন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে চলেছে, আর মাঝে মাঝে এপাশে ওপাশে থুতু ফেলছে। এর মধ্যে পেটের উপর জোরে হাত ঘষছে, মুখে তার বেদনার চিহ্ন। অতিরিক্ত কাঁচা গাজোর খাওয়ায় ওর পেটে ব্যথা হয়েছে। পথের দু পাশে গাজোর তুলেছে আর খেয়েছে।

'তুমি কি ভেবেছ? জর্জিয়ার বনেদি ঘরের ছেলে আমি, এই ছেঁড়া আর ময়লা পোশাকে নিজের শহরে গিয়ে ঢুকব? কখখনো নয়, এমনিভাবে কিছুতেই যেতে পারি নে আমি সেখানে। রাত পর্যন্ত শহরের বাইরে থাকতে হবে। এসো, এখানেই বিশ্রাম করা যাক।'

যেটুকু তামাক বাকি ছিল তাই দিয়ে দুটো সিগারেট কোনমতে পাকিয়ে নিলাম। তারপর শীতে কাঁপতে কাঁপতে একটা পোড়ো বাড়ীর দেয়ালের গায়ে বসে পড়লাম টানব বলে। কন্‌কনে হাওয়া ধারালো ছুরির মত গায়ে কেটে বসছে। শাক্রো গুন গুন করে একটা বিষাদের সুর ধরে। আর আমার মনশ্চক্ষে জেগে ওঠে, একখানা গরম ঘর, ভবঘুরে জীবনের তুলনায় স্থিতিস্থাপক জীবনের যত কিছু সুবিধা —সেই সব।

'চল, বসে থেকে কি হবে?' বেশ দৃঢ়ভাবেই বলে ওঠে শাক্রো।

অন্ধকার হয়ে গেছে। নীচে শহরের বুকে আলোগুলো ঝিক-মিক করছে। নীচের উপত্যকায় কুয়াশায় ঢাকা শহরের বুক থেকে মাঝে মাঝে একটার পর একটা আলো কুয়াশা ভেদ করে উঁকি মারছে, চমৎকার লাগছে দেখতে।

'দেখো, তোমার ওই কানঢাকা গরম টুপিটা আমায় দাও, ওটা দিয়ে আমি আমার মুখ ঢাকা দেবো। বন্ধুবান্ধবরা আমায় চিনে ফেলতে পারে।'

টুপিটা ওকে দিয়ে দিই। আমরা ততক্ষণে অল্‌গা স্ট্রীটে এসে পড়েছি। শাক্রো প্রাণখুলে শিস দিতে থাকে।

'ম্যাক্‌সিম, সামনে ওই পোলটা দেখতে পাচ্ছ, ওইখানে ট্রাম থামে। ওখানে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা কর, দোহাই তোমার! আমি আগে গিয়ে এই পাড়ায় এক বন্ধুর কাছ থেকে বাবা-মার খবরটা নিয়ে আসতে চাই।'

'দেরি হবে না ত? ঠিক?'

'এক মিনিট! তার বেশি নয়।'

হন্‌ হন্‌ করে সে পাশের সরু গলি দিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর মিলিয়ে গেল—মিলিয়ে গেল চিরদিনের জন্য!

আর কখনো তার সঙ্গে দেখা হয় নি। দীর্ঘ চার মাস যে আমার সহযাত্রী ছিল, আর কোন খোঁজ পাই নি তার। মাঝে মাঝে তার কথা মনে পড়ে, ভালই লাগে সে স্মৃতি। হালকা মনে হাসি আসে।

অনেক শিখিয়েছে আমাকে সে। বিজ্ঞ দার্শনিকদের ভারী ভারী কেতাবে সে শিক্ষা পাওয়া যায় না। মানুষের জ্ঞান থেকে জীবনের জ্ঞান অনেক গভীর, অনেক ব্যাপক।

মানুষের জন্ম

১৮৯২ সালের ঘটনা। দুর্ভিক্ষের বৎসর। জায়গাটা হল সুখুম আর ওচেমচিরির মাঝামাঝি, কোদর নদীর ধারে, সমুদ্রের এত কাছে যে, পাহাড়ী ঝরনার স্বচ্ছ জলের আনন্দ-উচ্ছল কলধ্বনির ভিতরও সমুদ্রের বজ্রগম্ভীর কল্লোল স্পষ্ট শোনা যায়।

শরতকালের দিন। কোদরের জলে নুয়ে-পড়া হলদে চেরি-লরেলের ডালপালার গায়ে চক্‌চকে সাদা ফেনাগুলি দেখে মনে হয় চপল সরপুঁটির ঝাঁক খেলা করে বেড়াচ্ছে। আমি নদীতীরের একটি টিলার উপর বসেছিলাম এবং মনে মনে এই কথাই ভাবছিলাম যে, গাংচিল ও উদবেরালেরাও সেই চেরিপল্লবগুলিকে নিশ্চয়ই মাছ মনে করেছে, তাই না তারা ডান দিকের গাছগুলোর পিছনে যেখানে সমুদ্রের কল্লোল শোনা যাচ্ছে সেখানে প্রাণপণে চেঁচামিচি শুরু করেছে।

মাথার উপর বাদামগাছের শাখা-প্রশাখাগুলিতে সোনালী রং ধরেছে ; আমার পায়ের তলায় মানুষের করপল্লবের মত রাশিকৃত পাতা ছড়িয়ে আছে। নদীর ওপারে হর্নবীম গাছের ডালপালাগুলি একেবারে নেড়া হয়ে পড়েছে। দেখে মনে হয় যে, ছেঁড়া জালের মত তার ডালপালাগুলো শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। সাদা আর হলদে রঙের পাহাড়ী কাঠঠোকরা তার কালো ঠোঁটের আঘাতে হর্নবীমের বল্কল ভেদ করবার জন্যে অবিশ্রান্ত আঘাত করে চলেছে, আর সেই আঘাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কীটপতঙ্গগুলিকে ধরবার জন্যে চারিদিক থেকে ছোট ছোট পাখীরা এসে জমেছে।

বাঁ দিকে পাহাড়ের মাথায় জমেছে ধোঁয়াচ্ছন্ন জলভরা মেঘ ; তারই ছায়া পড়ছে সবুজ পাদদেশে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি মরা গাছ ; বুড়ো বীচ ও লীম্ডেন গাছগুলির কোটরে আছে সেই মৌচাকের মধু যার মাদকতা পুরাকালে একদিন পম্পিউসের সৈন্যদের পতনের কারণ হয়েছিল, যে-সৈন্যরা শক্তিশালী রোমের পদাতিক বাহিনীকেও জয় করেছিল। মৌমাছিরা এই মধু লরেল আর আজালিয়ার ফুল থেকে সংগ্রহ করে, আর হা-ঘরেরা সেই মধু কোটর থেকে বের করে নিয়ে রুটিতে মাখিয়ে খায়। আমিও বাদামতলায় পাথরের উপর বসে বসে ঠিক তাই করছিলাম। একটা ক্রুদ্ধ মৌমাছি আমার গায়ে হুল ফোটাল, আর আমি কেৎলীভরা মধুতে রুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাচ্ছিলাম ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে শরতের অবসন্ন সূর্যের লীলা দেখছিলাম।

শরৎকালের ককেসাস পর্বত দেখে মনে হয় যেন মহা মহা ঋষির গড়া এক একটি বিরাট গির্জা—সে ঋষিরা আবার মহাপাপীও। বিবেকের দংশন থেকে তাদের অতীত পাপ গোপন করবার জন্যে তারা প্রচুর সোনা-দানা হীরা-জহরত দিয়ে বিরাট মন্দির তৈরি করিয়েছে ; পাহাড়ের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে সমরকন্দ শেমাহার তুর্কিদের তৈরি সূক্ষ্ম রেশমের কাজ করা বহুমূল্য গালিচা। তারা সারা দুনিয়া লুটপাট করে সবকিছু এনেছে এইখানে, সূর্যের কাছে, উদ্দেশ্য এই যে, এখন তারা বলবে, "হে তপন-দেব, এ সবই তোমার, তোমার লোক-জগৎ থেকে এনেছি, তোমারই জন্যে!"

. .দেখেছি দাড়িওয়ালা, শুভ্রকেশ দৈত্যেরা বড় বড় চোখে আনন্দ-চঞ্চল শিশুর প্রসন্নতা নিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছে পৃথিবীর শোভাবর্ধন করবার জন্যে। তারা দুহাতে বিচিত্র বর্ণের হীরামুক্তা ছড়াচ্ছে, পাহাড়ের মাথায় পরিয়ে দিচ্ছে স্তরে স্তরে রূপোর পুরু আবরণ। ঢালু উপত্যকাগুলিকে ঢেকে রেখেছে নানা বৃক্ষের জীবন্ত বসন। তাদের করস্পর্শে ধরিত্রীর এ অঞ্চল এক অলৌকিক সৌন্দর্য ধারণ করেছে।

এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মানো বড় মজার! কত আশ্চর্য

জিনিস দেখতে পাওয়া যায়! সৌন্দর্যের শান্ত ভাবাবিবেশে মনে যে বেদনা জাগে, এ আনন্দ তারই সামিল!

একথা সত্যি যে, জীবনে দুঃখের মুহূর্তও থাকেঃ বিদ্বেষে বুকের ভিতরটা জ্বলে যায়, দুঃখ যেন বুকের রক্ত শুষে নেয়, কিন্তু সে দুঃখের দিনও কাটে। এমন কি, ওই সূর্য মানুষের দিকে চেয়ে দুঃখে ম্লান হয়ে যায়—মানুষের জন্যে সে এত কঠোর পরিশ্রম করছে, তবু মানুষ কৃতকার্য হতে পারল না!...

অবশ্য ভাললোক যে নেই, এমন নয়, কিন্তু তাদের আরো সংশোধন দরকার। তাদের আরো ভাল হতে হবে, সম্পূর্ণ নতুন করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

...হঠাৎ, আমার বাঁ দিকের ঝোপগুলোর উপর দেখা গেল, কয়েকটি কালোমাথা নড়াচড়া করছে! সমুদ্রের গর্জন আর নদীর কলধ্বনির ভিতর থেকেও মানুষের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এরা সব দুর্ভিক্ষপীড়িত; সুখুম থেকে পায়ে হেঁটে আসছে ওচেমচিরি যাবে বলে। সেখানকার রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে, এবার তারা ওচেমচিরি চলেছে কাজের চেষ্টায়।

আমি ওদের চিনি, ওরা ওরেল প্রদেশের চাষী। একসঙ্গেই আমরা কাজ করেছি সুখুমে এবং কাল একসঙ্গেই কাজ থেকে ছাড়া পেয়েছি; তবে আমি চলে এসেছি ওদের আগে, রাত্রেই, সমুদ্রের ধারে সূর্যোদয় দেখব বলে।

চারটি পুরুষ ও একটি আসন্নপ্রসবা কৃষক তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। মেয়েটির চোয়ালের হাড় দুখানা উঁচু, পেটটা উঁচু হয়ে উপরে ঠেলে উঠেছে, ধূসর-নীল চোখদুটি যেন ভয়ে ঠিকরে পড়তে চায়। ঝোপের উপরে হলদে রুমালে ঢাকা তার চঞ্চল মাথাটি যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত সূর্যমুখী ফুলের মত বাতাসে দুলছে। খুব বেশি ফল খেয়ে সুখুমে তার স্বামী মারা গেছে। আমি এই সব লোকের সঙ্গেই একই কুলিধাওড়ায় থাকতাম। অতি-প্রাচীন কালের রুশীয় রীতি অনুযায়ী তারা আপন আপন দুর্ভাগ্যের

কথা এত জোর গলায় আলোচনা করত যে, তাদের সে-সব দুঃখের কাহিনী বহুবার আমার কানে গেছে।

এরা দুঃখের নিষ্পেষণে চূর্ণবিচূর্ণ। বাতাস যেমন শরৎকালে শুকনো পাতা উড়িয়ে নেয়, তেমনি ওরাও ওদের অনুর্বর ফতুর দেশ থেকে দুঃখের তাড়নায় এসে এখানে ছিটকে পড়েছে। এখানকার প্রকৃতির প্রাচুর্য ও অপরিচিত রূপ ওদের মনে তাক্ লাগিয়ে ওদের দিশেহারা করে দিয়েছে, কিন্তু কাজের পীড়াদায়ক অবস্থাটা অন্তরের সবটুকু সাহসই নিঃশেষে হরণ করেছে। নিস্তেজ ম্লান চোখে তারা অসহায়ভাবে মিটমিট করে জমির দিকে চেয়ে থাকে, করুণ হাসির সংগে পরস্পর শান্তকণ্ঠে বলাবলি করেঃ

'বাঃ . কি খাসা জমি!'

'এ জমিতে আপনা থেকেই সব কিছু জন্মায়!'

'হাঁ, তবে, পাথরের মতই শক্ত ..'

'আমি বলবই, এ জমিতে আবাদ করা খুব সহজ নয়। '

আর সংগে সংগে ওদের মনে পড়ে যায় কোবিলি লোঝোক, সুখোই-গোন, মোক্‌রেন্‌কির কথা—ওই সকল গ্রামে ওদের পিতৃপুরুষের ভিটা, সেখানকার একমুঠো মাটির সংগেও ওদের পূর্বপুরুষের ধূলি মিশে আছে। সে দেশের কথা কি কখনো ভুলতে পারে ? কত প্রিয় - তাদেরই গায়ের ঘামে সেখানকার মাটি সজল হয়েছে।

ওদের সংগে আর একটি স্ত্রীলোক আছে, সে লম্বা, খাড়া, তক্তার মত চওড়া, চোয়াল ঘোড়ার মত এবং টেরা, কয়লার মত কালো চোখ-দুটিতে মিশমিশে বিষণ্ণ দৃষ্টি।

সন্ধ্যাবেলায় হলদে রুমাল মাথায় স্ত্রীলোকটিকে সংগে নিয়ে সে ধাওড়ার বাইরে বেড়াতে বার হত এবং পাথরকুচির একটা স্তূপের উপর গালে হাত দিয়ে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইতঃ

কবরের ধারে—
সবুজ ঝোপের আড়ে,
বিছাব বসন
বালুকা তটের 'পরে।

যদি পাই দেখা,
পথ চেয়ে রব তায় ;
প্রিয়তম এলে করিব প্রণাম
মাথাটি রাখিয়া পায়।

ওর সঙ্গিনী সাধারণত ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করত, ওকে মনে করিয়ে দিত ওর গর্ভস্থ সন্তানের কথা, কখনো কখনো হঠাৎ সে নিজেও ওর সঙ্গে যোগ দিয়ে কেঁদে ফেলবার উপক্রম করত : পুরুষের মত ভাঙা গলায় অধীরভাবে গেয়ে উঠতঃ

হে প্রিয়, হে প্রিয়,
হে মোর দয়িত প্রিয়তম।
আর না হেরিব নয়নে তোমায়,
নিঠুর নিয়তি মম।

এখানে এই দক্ষিণ দেশের শ্বাসরোধী অন্ধকার রাত্রিতে করুণ গানের সুরের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে উত্তরাঞ্চলের কথা, যেখানে অনুর্বর মাঠ বরফে ঢাকা, শাঁ শাঁ করে তুষারের ঝড় বয়ে যায়, দূরে নেকড়ে বাঘের ডাক শোনা যায়।...

তারপর ওই টেরা মেয়েটি হঠাৎ জ্বরে পড়ল। ত্রিপলের খাটিয়ায় শুইয়ে তাকে শহরে নিয়ে গেল। সে পথে যেতে যেতে কাঁপছিল আর গোঁ গোঁ করছিল—যেন সেই কবরের ধারে বালুকাতটের গানই আপন মনে গেয়ে চলেছে।

. .হলদে রুমাল-ঢাকা মাথাটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রাতরাশ সেরে আমি মধুর কেৎলির মুখ পাতা দিয়ে মুড়ে বোঁচকাটি বেঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে রওনা দিলাম—এই পথেই আরো অনেকে এগিয়ে গিয়েছে, তাদের অনুসরণ করেই আমিও পাথুরে পথে চেরি কাঠের লাঠি ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে এগিয়ে চললাম।

আমিও এসে পড়লাম সরু একফালি ধূসর রাস্তার উপর। ডান দিকে গভীর নীল সমুদ্র ঢেউ খেলে যাচ্ছে—যেন একসঙ্গে হাজার

হাজার অদৃশ্য ছুতোর রেঁদা চালাচ্ছে, আর রাশি রাশি শুভ্র ছিল্‌কে বাতাসে গড়াতে গড়াতে সশব্দে লুটিয়ে পড়ছে তটভূমিতে ; সে বাতাস আর্দ্র অথচ উষ্ণ ; স্বাস্থ্যবতী রমণীর নিশ্বাসের মত সুগন্ধি। একখানি তুর্কী জাহাজ বন্দরে এসে ভিড়েছে। জাহাজখানি আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে সুখুমের দিকে ; বাতাসে পাল ফুলে উঠেছে—সুখুমের একজন বড় ইঞ্জিনিয়ারের গালদুটো যেমন চীৎকার করবার সময় ফুলে উঠত।

সে বলত, 'চুপ করো, তুমি চালাক হতে পার, কিন্তু আমি এই মুহূর্তে তোমাকে থানায় বেঁধে নেওয়াতে পারি!'

লোকটা গ্রেফতার করে মানুষকে থানায় নিয়ে যেতে ভালোবাসত। অবশ্য একথা ভাবতে খুবই ভাল লাগে যে, এতদিনে পোকায় তার হাড় পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছে।

...বেশ আরামেই চলেছি! যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছি! মনে সুন্দর চিন্তা আসছে, পুরোনো দিনের স্মৃতি কখনো ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। মনের এই সব চিন্তা সমুদ্রের এক একটি বুদ্‌বুদের মত। তখনই উপরে ভেসে ওঠে, আবার পরক্ষণেই অতলে তলিয়ে যায়। যৌবনের উজ্জ্বল আশা-আকাঙ্ক্ষা রুপালী মাছের মত মনের সে অতল সমুদ্রে সাঁতার কেটে বেড়ায়।

সমুদ্রের ধারে ধারে রাস্তাটি চলেছে ; এঁকে বেঁকে সর্পিল গতিতে বালুকাময় তটভূমির পাশে পাশে চলেছে ঢেউয়ের সংঘাত বাঁচিয়ে। ঝোপগুলোও যেন ঢেউয়ের মুখে লুটিয়ে পড়তে চায়, তাই তারা সেই আঁকাবাঁকা পথের উপর নুইয়ে পড়েছে—যেন ওই সুদূরে বিস্তৃত নীল জলরাশিকে অভিনন্দিত করে।

পাহাড় থেকে হাওয়া বইতে শুরু করেছে, বৃষ্টি হবে।

...ঝোপের ভিতর থেকে অস্পষ্ট কাত্‌রানি শোনা যায়—পীড়িত মানুষের কাত্‌রানি, যাতে মন সমবেদনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ঝোপের ভিতর দিয়ে পথ করে আমি হলদে রুমাল মাথায় বাঁধা সেই কৃষক মেয়েটির কাছে এসে উপস্থিত হলাম। সে একটি বাদাম গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। তার মাথাটা ঘাড়ের উপর ঝুলে

পড়েছে, মুখে একটা বিকৃত ভঙ্গি, ঝাপসা চোখ দুটো যেন ঠিকরে পড়তে চায়। বড় পেটটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে এমন অস্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে যে, পেটটা খিঁচুনি রোগীর মত ওঠা-নামা করছে। নেকড়ে বাঘের মত হলদে দাঁতগুলি বের করে গরুর মত গোঁ গোঁ শব্দ করছে।

'কি হয়েছে তোমার? কেউ কি মেরেছে?' নীচু হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। ধূসর রঙের ধুলো-মাখা এক পা দিয়ে আর একটা পা-কে ঘষছে—যেমন করে মাছি নিজেকে পরিষ্কার করে। ভারী মাথাটা কোন মতে নেড়ে সে বললেঃ

'চলে যাও ... নির্লজ্জ কোথাকার ... যাও বলছি .'

অবস্থাটা সবই বুঝলাম। এ-রকম অবস্থা আগেও দেখেছি। অবশ্য, ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে সরে গেলাম রাস্তার উপর। কিন্তু মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরে কোঁথাতে লাগল। ফেটে পড়বার মত চোখ দুটো থেকে জল গড়িয়ে ক্লিষ্ট লাল দুটি গণ্ড বেয়ে পড়ছিল।

এ দেখে আমি আবার তার কাছে ফিরে এলাম। বুচঁকি, কেৎলি ও টি-পটটা মাটিতে নামিয়ে রাখলাম। তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে হাঁটু দুটো মুড়ে দিলাম। সে আমার মুখে ও বুকে ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিল এবং উপুড় হয়ে ক্রুদ্ধ ভালুকের মত গর্জন করে গালাগালি দিতে দিতে হামাগুড়ি দিয়ে আবার ঝোপের ভিতর ঢুকলঃ

'শয়তান ... জানোয়ার ...' সে চীৎকার করে উঠল। দুই হাতের উপর ভর করে মাটিতে মুখ গুজে পড়ে পা দুটো ছড়িয়ে চেঁচামিচি করতে লাগল।

তার হাত দুটো অবশ হয়ে গেল, সে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। আবার সে চেঁচিয়ে উঠল, আবার পা দুটো ছড়িয়ে দিল।

উত্তেজনার বশে, এবং এক্ষেত্রে কি করা উচিত সে সম্বন্ধে যা-কিছু জানতাম সেটুকু স্মরণ করে নিয়ে ওকে আবার চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে পা দুটো মুড়ে দিলাম। ছেলেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

'চুপ করে শুয়ে থাকো, এখনই প্রসব হয়ে যাবে!' তাকে বললাম।

তারপর সমুদ্রের ধারে ছুটে গেলাম, জামার হাতা গুটিয়ে নিয়ে হাত

দুখানি ভাল করে ধুয়ে ফেললাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে দাইয়ের কাজে লেগে গেলাম।

বার্চ গাছের ছাল আগুনে দিলে যেমন কুঁকড়ে যায়, এই মেয়েটিও তেমনি ভাবে যন্ত্রণায় কোঁকড়াতে লাগল। হাত দিয়ে খামচে কতকগুলি শুকনো ঘাস তুলে নিয়ে সেগুলি নিজের মুখে পুরে দিতে চাইল। রক্তাভ চোখে অমানুষিক বীভৎস মুখে সে মাটি ছড়াতে লাগল। ইতিমধ্যে শিশুর মাথাটি দৃষ্টিগোচব হল। তার পা দুখানা ধরে রাখলাম. কুঁকড়ে না যায়, ছেলেটার দিকে লক্ষ্য রাখলাম, শুকনো মুখে ঘাস পুরে না দেয়—সেদিকেও নজর দিলাম।..

আমরা উভয়ে উভয়কে খানিকটা গালাগালি দিলাম, ওদিল দাঁতে দাঁত চেপে, আর আমি দিলাম দম বন্ধ করে। ও গাল দিল যন্ত্রণা এবং হয় ত লজ্জার বশবর্তী হয়ে, আর আমি অস্বস্তি ও ওর প্রতি আত্যন্তিক করুণার বশে।..

'ভ-ভগবান!' বার বার এই শব্দটা ও ঘড়্ ঘড়্ শব্দে আওড়াতে লাগল। ওর নীল ঠোঁট দুটি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে, মুখে ফেনা ভাঙছে. চোখ দুটো দেখে মনে হয়, যেন সূর্যের উত্তাপে হঠাৎ ঝলসে গেছে, অবিশ্রান্ত জল পড়ছে মা হওয়ার অসহ বেদনায়; শরীরটা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে—যেন ভেঙে দু টুক্‌রো হয়ে যাবে।

'চলে—যাও এখান—থেকে, শয়তান—কোথাকার!...' ও বলে।

আমাকে ও শিথিল দুর্বল হাত দুটি দিয়ে ঠেলতে লাগল, কিন্তু আমি বার বার বুঝিয়ে বললামঃ

'খালাস হও বেকুব, তাড়াতাড়ি খালাস হও।...'

আমার মনটা ওর প্রতি করুণায় ভরে উঠেছিল। ওর চোখের জল যেন আমার চোখ ফেটে বেরুচ্ছিল, ওর যন্ত্রণা দেখে আমার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠছিল। মনে হল, চীৎকার করে উঠি, এবং চীৎকার করেই উঠলামঃ

'বেগ দাও, দেরি করো না!'

অবশেষে একটি মানব-শিশু আমার হাতের উপর এল। আমি সজল চোখে দেখলাম, তার সারা দেহ লাল, সে যেন পৃথিবীর উপর

অসন্তোষ নিয়েই এসেছে। হাত-পা ছুঁড়ছে এবং ভারী গলায় ট্যাঁ ট্যাঁ করছে—যেন এখনও তার মায়ের দেহেই আবদ্ধ থেকে গেছে। চোখ দুটি নীল, কিম্ভূতকিমাকার, বোঁচা নাকটা লাল চ্যাপ্টা মুখখানায় মিশে গেছে, ঠোঁট দুখানি নড়ছে এবং চীৎকার করছে—'ওঙা.. ওঙা! ...'

তার সারা দেহ এমন পিছল হয়েছিল যে আমি একটু অসাবধান হলেই সে আমার হাত থেকে ফসকে পড়ে যেত। হাঁটু গেড়ে বসে আমি তার দিকে চেয়ে হাসলাম। তাকে দেখে আমার খুবই আনন্দ হল। আমি ভুলেই গেলাম, এর পর আমাকে কি করতে হবে।

'নাড়ীটা কেটে ফেলো...' মা মৃদুগলায় বললেন, তার চোখ দুটি এখন বুজে এসেছে, মুখখানি শিথিল হয়ে পড়েছে। মুখের মেটে রং দেখে মনে হয় সে যেন মরে গেছে, কেবলমাত্র নীল ঠোঁট দুখানি কাঁপছেঃ

'ওটা কেটে ফেলো ... তোমার ছুরি দিয়ে।. .'

ধাওড়ায় থাকতেই আমার ছুরিখানা চুরি হয়ে গেছল। কাজেই দাঁত দিয়েই নাড়ীটা কেটে ফেললাম। বাচ্চাটা অবসন্নভাবে কেঁদে উঠল—তার কণ্ঠে ওরেল প্রদেশের খাদ মেশানো খাঁটি সুর। মা একবার মৃদু হাসলেন। আশ্চর্যভাবে ও সামলে উঠল। তার অতল স্পর্শ চোখ দুটি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, নীল তারা দুটি জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। নিষ্প্রভ হাতখানি দিয়ে সে তার জামার পকেট হাতড়াতে লাগল, তারপর দাঁতের আঘাতে রক্তাক্ত ঠোঁট দুখানি নেড়ে কোনমতে উচ্চারণ করলঃ

'আমার শক্তি নেই ..ফিতে...পকেটে আছে...নাইটা বেঁধে দিতে হবে।'

ফিতেটা বার করে তাই দিয়ে ছেলেটার নাই বেঁধে দিলাম। মায়ের মুখেব হাসি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে হাসি এত আন্তরিক ও দীপ্ত যে, দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

'এবার নিজেকে ঠিক করে নাও, আমি বললাম। 'আমি এখন একে ধুইয়ে নিয়ে আসি।'

'কিন্তু দেখো,' ও অস্বস্তির সঙ্গে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'খুব আস্তে আস্তে যেয়ো।'

এ লাল ব্যক্তিটি কিন্তু ভাল ব্যবহার চায় না, মোটেই চায় না; সে দুখানি হাতই মুঠো করে এমনি করে চেঁচাতে শুরু করলে যে, সে যেন আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছেঃ

'ওঙা ওঙা...'

'হাঁ, তুমি তুমি! জোরের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর ভাই, নইলে তোমার প্রতিবেশীরা ঠিক তোমার ঘাড় ভেঙে দেবে,' আমি তাকে সাবধান করে দিলাম।

সমুদ্রের যে ফেনিল ঢেউটা এসে আমাদের গায়ে উচ্ছলভাবে আছড়ে পড়ল তার জল সর্বপ্রথম গায়ে লাগতেই সে একবার প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল। তারপর আমি যখন তার বুক ও পিঠ ধুয়ে দিলাম, সে চোখ বুজে হাত-পা ছুঁড়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদতে লাগল।

'চেঁচামিচি করো, বুড়ো! যত পার গলা ফাটিয়ে চীৎকার কর! ওদের দেখাও যে তুমি ওরেলের বাসিন্দা!' আমি চেঁচিয়ে সমর্থন করলাম।

আমি যখন তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম তখন মা চোখ দুটি বন্ধ করে দাঁতে ঠোঁট চেপে পড়ে ছিল। তখন তার ফুল পড়ার ভেদাল ব্যথা হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও কাতরানির ভিতর দিয়ে তার অস্পষ্ট কথা আমি শুনতে পেলামঃ

'দাও...আমার কাছে ওকে দাও।...'

'থাক না।'

'না,.. না,...আমার...কাছে...দাও।'

কম্পিত হাত দুটো দিয়ে সে ব্লাউজের বোতামগুলো খুলে ফেলল। আমি তার বুকের কাপড় উন্মুক্ত করতে সাহায্য করলাম, অন্তত বিশটি শিশুর জন্য প্রকৃতির গড়া প্রাণ-ভান্ডার! তারপর রোরুদ্যমান ওরেল-বাসীটিকে আমি তার উষ্ণ দেহের উপর শুইয়ে দিলাম। অবস্থাটা সে মুহূর্তেই বুঝে নিল, সঙ্গে সঙ্গেই তার কান্না গেল থেমে।

"হে ঈশ্বরজননী, চিরশুদ্ধা ভার্জিন," দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে বার বার বলতে লাগল মা, আর আমার বোঁচকাটার উপর মাথাটা এপাশ ওপাশ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ মৃদু আর্তনাদ করে নীরব হয়ে গেল সে।

এবার সে তার চোখ দুটি মেলে চাইল, সে চোখের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়, সদ্য প্রসবকারিণী জননীর পবিত্র দৃষ্টি সে চোখে। নীল চোখ দুটি দিয়ে নীল আকাশের দিকে চেয়ে রইল। আনন্দভরা কৃতজ্ঞতার হাসির প্রভা ফুটে গলে পড়ল সে চোখে। অবসন্ন হাতে ধীরে ধীরে নিজের ও শিশুর দেহে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিল।

"তোমারি জয় হোক হে চির-পবিত্রা ঈশ্বর-জননী," আবার বলল, 'ওঃ.. জয়... !'

তাঁর চোখের আলো আবার মিলিয়ে গেল। মুখখানি আবার বেদনা-ক্লিষ্ট দেখা গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সে, সামান্য নিশ্বাস পড়ছিল শুধু। কিন্তু হঠাৎ সে দৃঢ় ও প্রকৃতিস্থ কণ্ঠে বলে উঠলঃ

'আমার থলেটা খোল ত বাছা।'

আমি থলেটা খুলে ফেললাম। সে মনোযোগের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণভাবে হাসল; আমার মনে হল, তার বসে-যাওয়া গালে ও ঘামে ভিজা কপালে সামান্য রক্তিমাভা দেখতে পেলাম।

'যদি কিছু মনে না কর. .'

'এত করে বলবার কি আছে. '

'এখান থেকে একটু সরে যাও।' সে বললে।

'দেখো, যেন বেশি নড়াচড়া করো না,' আমি ওকে সাবধান করে দিলাম।

'ঠিক আছে...ঠিক আছে...তুমি যাও ত এখন...'

আমি কাছেই ঝোপের ভিতর গিয়ে ঢুকলাম। খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে। মনে হল, মনের মধ্যে পাখীর দল মৃদু কণ্ঠে মধুর গান গাইছে, সেই সঙ্গে মিশেছে সমুদ্রের অবিরাম কল্লোল; মনে হল, এই গান সারা বছর ধরে শুনলেও আমার ক্লান্তি আসবে না।

অদূরে একটি ঝরনা কুলুকুলু ধ্বনি করে চলেছেঃ যেন কোন তরুণী প্রণয়ীর কথা বলছে বন্ধুর কাছে।

এমন সময় ঝোপের উপর দিয়ে একটা মাথা উঁচু হতে দেখা গেল, হলদে রঙের একখানি রুমাল তাতে পরিপাটি করে বাঁধা।

'কি ব্যাপার?' আমি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। 'এত তাড়াতাড়ি তোমার চলাফেরা করা উচিত হয়েছে কি? বল?'

একটা গাছের ডাল ধরে বসে রইল মেয়েটি, দেখে মনে হল, যেন দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে মুখে এতটুকু রঙের লেশ মাত্র নেই, শুধু চোখ দুটি প্রকান্ড নীল হ্রদের মত দেখাচ্ছে। কমনীয় হাসি হেসে সে বলে উঠলঃ

'দ্যাখো, কেমন ঘুমুচ্ছে।...'

হাঁ, ঘুমোচ্ছিলই বটে, কিন্তু যত দূর মনে হল, অন্য যে-কোন ঘুমন্ত শিশু থেকে পার্থক্য কিছুই নেই, পার্থক্য যা আছে, তা পরিবেশে। একটা ঝোপের নীচে শরতের উজ্জ্বল দিনে পাতার স্তূপের উপর শুয়ে আছে শিশু, ওরেল প্রদেশে ও পাতা মেলে না।

'তোমার এখন একটু শুয়ে পড়া উচিত, মা,' আমি বললাম।

'না-আ-আ...' শিথিলভাবে মাথা নেড়ে মা জবাব দিল। 'আমাকে এখনি সব গুছিয়ে নিয়ে সেখানে রওনা হতে হবে, কি যেন সে জায়গাটার নাম?'

'ওচেমচিরি?'

'হাঁ, ঠিক তাই। মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গীরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনেক দূর এগিয়ে গেছে।'

'কিন্তু তুমি কি হাঁটতে পারবে?'

'কেন, ভার্জিন মেরি? তিনি কি আমাকে সাহায্য করবেন না?'

বেশ, ও যখন ভার্জিন মেরির সঙ্গেই চলেছে, তা হলে আমার আর কি বলবার থাকতে পারে!

সেই ছোট্ট কুঞ্চিত বিরক্তিভরা মুখখানির দিকে ও একবার তাকাল, ওর চোখ দুটি থেকে নিবিড় স্নেহের রশ্মি বিকীরিত হচ্ছিল। ঠোঁট দুটি একবার চেটে নিয়ে হাত দুখানি আস্তে আস্তে নিজের বুকে বুলিয়ে নিল।

আমি খানিকটা আগুন জ্বালিয়ে কেৎলিটা বসাবার জন্য কয়েকখানি পাথর সাজিয়ে দিলাম সেখানে।

'এক মিনিটের মধ্যেই তোমাকে খানিকটা চা করে দিচ্ছি মা,' আমি বললাম।

'ওঃ, খাসা হবে...বুকটা যেন শুকিয়ে গেছে,' ও জবাব করলে।

'তোমার দলের লোকেরা কি তোমাকে ফেলেই পালিয়েছে?'

'না, তা করবে কেন? আমিই পিছিয়ে পড়েছিলাম। তারা দু-এক পাত্র খেয়েছিল বসে...। ভালই হয়েছে, তারা যদি এখন আশপাশে থাকত, কি করতাম জানি না!'

আমার দিকে এক নজর চেয়ে সে বাহু দিয়ে মুখখানা ঢাকল, তারপর রক্তাক্ত থুথু ফেলে হাসল সলাজ হাসি।

'এ কি তোমার প্রথম?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'হ্যাঁ, এই প্রথম।...কিন্তু, তুমি কে?'

'একটা মানুষ বলেই ত মনে হচ্ছে।...'

'হাঁ, মানুষ তা বুঝতে পারলাম, বিয়ে হয়েছে?'

'বরাতে জোটে নি।'

'মিছে কথা বলছ, না?'

'না। মিছে বলব কেন?'

চোখ দুটি নামিয়ে কি ভাবতে লাগল ও, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'এ সব মেয়েলি ব্যাপার তুমি জানলে কি করে?'

এবার মিথ্যে কথাই বললামঃ

'আমি এ সব পড়েছি, আমি ছাত্র, জান তা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। আমাদের পুরোহিতের যে বড় ছেলে সেও ছাত্র, পুরোহিত হওয়ার জন্য পড়ছে।...'

'হ্যাঁ, আমিও তাদেরই মত একজন...যাক, এখন কেৎলিটায় জল ভরে নিয়ে আসি।'

শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কি না, তা দেখবার জন্য মেয়েটি মাথা হেঁট করল। তারপর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললঃ

'হাত-মুখ ধুয়ে নেবো ভাবছিলাম, কিন্তু জল কেমন, তা ত জানি না...কেমন জল? যেমন নোনা তেমনি বিস্বাদ।'

'বেশ, হাত মুখ ধুয়ে এসো গে। এ জল শরীরের পক্ষে ভাল।'

'কি!'

'আমি সত্যি কথাই বলছি। ঝরনার জলের চেয়েও এ জল গরম। এখানকার ঝরনার জল ত বরফের মত ঠাণ্ডা।'

'তুমিই ভাল জান।'

এক জন আবখাজিয়ান ভেড়ার চামড়ার ছেঁড়া টুপি মাথায় দিয়ে টুক্ টুক্ করে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল, মাথাটা তার ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর, ঝিমোচ্ছে। তার ছোট বলিষ্ঠ ঘোড়াটা কান খাড়া করে আড় চোখে একবার আমাদের দিকে চাইল, তারপর চিঁহিঁ করে উঠতেই অশ্বারোহী ঝাঁকুনি খেয়ে মাথা তুলল। একবার দেখে নিল আমাদের দিকে, তার পরেই আবার ঝুঁকে পড়ল মাথাটা।

'এখানকার লোকগুলি খুব মজার। দেখলে কিন্তু ভয়ও করে,' ওরেলের মেয়েটি শান্তস্বরে বললে।

আমি ঝরনার দিকে গেলাম। ঝরনার স্বচ্ছ জল পারার মত তর্‌তরিয়ে চলেছে, পাথরের উপর দিয়ে যেতে কলকল বক্ বক্—নানা রকম শব্দ করছে। সেই জলে শরতের ঝরা পাতাগুলি ভেসে চলেছে ঘুরতে ঘুরতে। চমৎকার! হাত মুখ ধুয়ে আমি কেৎলিটা ভরে নিয়ে এলাম। আসতে আসতে ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, মেয়েটি হাতে পায়ে ভর করে উবু হয়ে চলছে মাটি পাথরের উপর দিয়ে আর অস্বস্তিভরে পিছনে তাকাচ্ছে।

'ব্যাপার কি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

মেয়েটি আঁতকে উঠল। থেমে গেল হঠাৎ। মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা। কাপড়ের ভিতর কি যেন লুকোবার চেষ্টা করছিল। আমি বুঝলাম, সেটা কি।

'আমাকে দাও,' তাকে বললাম। 'আমি মাটিতে পুঁতে ফেলছি।'

'কিন্তু ভাই, তুমি কি বলছ? স্নানের ঘরের মেঝের নীচে এটা পোঁতার নিয়ম।'

'তুমি কি ভাবছ, তোমার জন্য কেউ কি চটপট একটা স্নানের ঘর করে দেবে এখানে?'

'তোমার কাছে এটা ঠাট্টা হতে পারে, কিন্তু আমার ভয় হয়। যদি কোন বন্য জন্তু খেয়ে ফেলে! এটা বসুমতীকেই ফিরিয়ে দিতে হয়, জান তুমি?'

এই কথা বলেই সে অন্য দিকে মুখ ফেরাল, তারপর একটা ভারী

ভিজে পুঁটলি তুলে দিল আমার হাতে। কাকুতিভরা কণ্ঠে লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে উঠল ঃ

'তুমি এটা ভাল করে পুঁতে ফেলো, কেমন ত? যত নীচে পার, যীশুর দোহাই!... আমার বাছার মুখ চেয়ে কাজটি ভাল করে কর, ...কেমন?'

আমি যখন ফিরে এলাম তখন সে সমুদ্রের ধার থেকে ফিরছে। পা দুটো কাঁপছে তার, হাত দুটো সামনে বাড়ানো, পরনের ঘাঘরাটা কোমর পর্যন্ত ভিজে, মুখে একটু রং লেগেছে—যেন ভিতরের কোন জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ওকে ধরে আগুনের কাছে নিয়ে গেলাম, আপন মনেই ভাবলাম ঃ

'ওর গায়ে কি ষাঁড়ের মত জোর!'

তারপর দুজনে মিলে মধু দিয়ে যখন চা খাচ্ছি ও আমাকে শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ঃ

'তুমি কি তোমার বইয়ের পড়া খতম করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? মদ ধরেছিলে কি?'

'হ্যাঁ মা, একেবারে গোল্লায় গিয়েছিলাম।'

'বেশ করেছিলে! আমার মনে পড়ছে, সুখুমে তোমাকে দেখেছিলাম খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে সর্দারের সঙ্গে তর্ক করতে। সেদিন মনে মনে বলেছিলাম, লোকটা নিশ্চয়ই মাতাল। কোন কিছুতেই ভয় পায় না।'

সদ্যোজাত ওরেলবাসীটি শান্তভাবে যেখানে ঘুমিয়ে আছে, পুরু ঠোঁট থেকে মধুটা চাটতে চাটতে বার বার সে দিকে নীল চোখের দৃষ্টি ফেরাতে লাগল।

'ও বাঁচবে কি করে?' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ও বলে উঠল। 'তুমি আমাকে সাহায্য করেছ, তার জন্য ধন্যবাদ।...কিন্তু এতে কি ওর কল্যাণ হবে?... জানি না।...'

খাওয়া শেষ করে ও নিজের গায়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। আমি যতক্ষণ জিনিসপত্রগুলি গুছিয়ে নিচ্ছিলাম, ও একদৃষ্টে মাটির দিকে তাকিয়ে

ঘুমে ঢুলছিল, বোধ হয় ডুবে ছিল চিন্তায়। চোখ দুটো মনে হল, আবার ম্লান হয়ে গেছে। একটু পরেই ও উঠে দাঁড়াল।

'তুমি সত্যি যাচ্ছ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'হ্যাঁ।'

'সামলে চলো কিন্তু মা।'

'কেন? ভার্জিন মেরি...ওকে তুলে নিয়ে আমার কাছে দাও।'

'আমি ওকে নিয়ে যাব।'

এ নিয়ে দুজনে খানিকটা তর্ক করলাম। শেষ পর্যন্ত ও রাজী হল, তারপর আমরা রওনা হলাম, চললাম পাশাপাশি, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

'হোঁচট খেয়ে পড়বে না আশা করি,' ও বললে। দুষ্টু হাসি হেসে আমার কাঁধের উপর বাহুটা তুলে দিল।

রুশ দেশের এই অজ্ঞাত-ভবিতব্য অধিবাসীটি আমার কোলে শুয়ে সশব্দে নাক ডাকাচ্ছে। সাদা ফেনার কল্কা-পরা সমুদ্রের ঢেউগুলি কল্ কল্ করছে, সশব্দে আছড়ে পড়ছে তীরে। ঝোপগুলো কানাকানি করছে, মধ্যগগন পার হয়ে সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

আমরা মন্থর গতিতে হেঁটে চলেছি। মাঝে মাঝে থেমে পড়ছে মা, গভীর একটা নিশ্বাস নিচ্ছে। পিছন দিকে মাথা ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছে চারপাশ—সাগর, বন, পাহাড়। তারপর তাকাচ্ছে ছেলের মুখের দিকে। চোখ দুটি বেদনাব অশ্রুতে একেবারে ধুয়ে গেছে। সেখানে ফুটে উঠেছে অপূর্ব স্বচ্ছতা। আবার সেখানে জ্বলছে অফুরন্ত ভালোবাসার নীলাভ শিখা।

একবার সে থেমে পড়ল, বলল ঃ

'হে মঙ্গলময় প্রভু! কি চমৎকার, কি কল্যাণময়! এইভাবে যদি আমি চলতে পারি চিরদিন, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত, আর আমার এই ক্ষুদ্র শিশু বেড়ে ওঠে মুক্ত পরিবেশের মধ্যে, তার মায়ের বুকের কাছে, আমার স্নেহের দুলাল...'

...সমুদ্র তখন অবিরাম কল্লোল ধ্বনি করে চলেছে...

বুড়ী ইজেরগিল

গল্পগুলো আমি শুনেছি বেসারাবিয়ার উপকূল অঞ্চলে, জায়গাটা আক্কেরমানের কাছে।

সন্ধ্যা হয়েছে। সারা দিনের আঙুর তোলার কাজ শেষ করেছি আমরা; কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্মসঙ্গী মল্‌ডাভিয়ার লোকগুলি সাগর বেলার দিকে চলে গেল। বুড়ী ইজেরগিলের সঙ্গে আমি রয়ে গেলাম সেখানে। ঘন আঙুর-ঝোপের ছায়ায় মাটিতে গা এলিয়ে দিলাম, চুপ করে দেখতে লাগলাম, সৈকতাভিমুখী কালো ছায়াগুলি ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

হাসি গানে মশগুল হয়ে তারা চলেছে বেলাভূমির দিকে। পুরুষগুলোর পরনে খাটো আলখাল্লা ও ঢিলে পাৎলুন, পোড়া তামাটে মুখে কালো মোটা গোঁফ আর মাথা ভরা কালো চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়েছে। মেয়েরা চলেছে হাসিখুশি, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তাদের, চোখ ঘন নীল, মুখ তাদেরও পোড়া তামাটে। রেশমের মত কালো চুলগুলি এলিয়ে পড়ছে পিঠে। উষ্ণ হালকা হাওয়া দুলিয়ে দিচ্ছে ঘন কেশ, আর ঠুন ঠুন করে বেজে উঠছে কেশাভরণ টাকা-সিকির মালাগুলো। সমান ধারায় বাতাস বইছে অনেকটা জায়গা জুড়ে কিন্তু হঠাৎ যখন আসে দমকা হাওয়া—যেন কোন অদৃশ্য ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠছে। মেয়েদের মাথার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে চুলগুলো, কেশরের মত অদ্ভুত রূপ নেয়। সে অবস্থায় তাদের দেখলে মনে হয় যেন কোন্ রূপকথার অদ্ভুত জগৎ থেকে বেরিয়ে এসেছে তারা। যত দূর তারা এগিয়ে যেতে থাকে, রাতের

আঁধার আর আমার কল্পনা ততই তাদের সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে।

কোথায় কে যেন একটা বেহালা বাজাচ্ছে।...একটি মেয়ে মিহি সুরে খাদে গান ধরেছে। হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।...

সমুদ্রের উগ্র গন্ধ ও ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধে বাতাস ভরপুর; সূর্যাস্তের কিছু পূর্বেই এক পশলা জোর বৃষ্টিতে মাটি ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে গেছে। এখনো আকাশেব এখানে সেখানে বিচিত্র বর্ণের ও অদ্ভুত আকারের মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, কোথাও বা হালকা, যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী, নীল বা ছাই রঙের, কোথাও বা এবড়ো থেবড়ো যেন পাহাড়ের অংশ, কাল্‌চে বং, কোথাও বা পিঙ্গল বর্ণ। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের ফালিগুলো সাগ্রহে উঁকি মারছে, সোনালী তারায় খচিত সেই ফালিগুলি। এইসব-শব্দ ও গন্ধ মেঘ ও মানুষগুলো—সব কিছুই কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে, সুন্দর অথচ বিষাদমাখা, যেন কোন বিস্ময়কর কাহিনীর উদ্বোধন। সবকিছু দেখেই মনে হচ্ছে যেন তাদের বিকাশে বাধা পড়েছে, মরে যাচ্ছে যেন সব। মানুষগুলোর কণ্ঠস্বর ক্রমে দূরে সরে যায়, তার পর মিলিয়ে যায়, বিষাদমাখান দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়া যেন আর কিছুই নেই।

'তুমি ওদের সঙ্গে যাওনি কেন?' যে দিকে ওরা চলে গেল সেই দিক পানে মাথা নেড়ে বুড়ী ইজেরগিল আমাকে জিজ্ঞাসা করে।

বয়সের ভারে বুড়ী বেঁকে তিনমাথা হয়ে গেছে। তার এককালের উজ্জ্বল কালো চোখ দুটি আজ নিষ্প্রভ, তার দৃষ্টি ক্ষীণ। তার গলার শুকনো আওয়াজ কেমন অদ্ভুত শোনায়, কড়মড় করে ওঠে—যেন হাড় চিবোচ্ছে।

'যাবার মন হল না,' আমি বললাম।

'এ্যাঁঃ...তোরা—রুশগুলো জন্মবুড়ো, সব যেন আঁধার-মুখো দানো! ..আমাদের মেয়েরা তোদের ডরায়। কিন্তু তোদের বয়েসকাল, ইয়া তাগড়া যোয়ান।..'

আকাশে চাঁদ উঠে আসে, মস্তবড় গোল রক্তের মত লাল; মনে হয় যেন স্টেপির অন্তঃস্তল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। এই স্টেপি কালে কালে কত নররক্ত নরমাংস আত্মসাৎ করেছে, হয় ত তারি ফলে এর সমৃদ্ধি

ও উর্বরতা। চাঁদের আলোয় আমাদের গায়ে আঙুর-লতার ছায়া পড়ে. বোনা-লেসের মত সে ছায়া; আমি ও বুড়ী যেন জালে ঢাকা পড়ে গেছি। আমাদের বাঁ দিক দিয়ে চঞ্চল মেঘের ছায়া ছুটে যায় স্টেপি পেরিয়ে। চাঁদের নীলাভ আলোয় মেঘগুলি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অনেক হালকা ও স্বচ্ছ মনে হয়।

'দ্যাখ্, দ্যাখ্! ওই দ্যাখ্ লারা!'

কম্পমান হাতের বাঁকা আঙুলগুলি দিয়ে বুড়ী যেদিকে দেখিয়ে দেয় আমি সেদিকে তাকাই, অনেকগুলি ভাসমান ছায়া চোখে পড়ে; কিন্তু অন্যগুলির চেয়ে একটা বেশি কালো ও ঘন মনে হয়। আর সবার চেয়ে জোরে ও নীচু দিয়ে ছুটেছে সেটা। যে মেঘটা ভাসছিল সব চেয়ে নীচে মাটির কাছে, চলেছিল সব চেয়ে জোরে—তার থেকেই সেটা খসে পড়েছে যেন।

'আমি ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না,' আমি বলি।

'তোর চোখ এই বুড়ীর চোখের চেয়েও খারাপ। চেয়ে দ্যাখ ওই দিকে, ওই আঁধারটা রে, স্টেপির উপর দিয়ে ছুটছে!'

আমি আবার তাকাই, ছায়াগুলি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

'ওটা ত ছায়া, ওকে লারা বলছ কেন?'

'লারা বলেই লারা বলছি। এখন সে ছায়া ছাড়া আর কি? এতে আশ্চর্য হবার কি আছে! হাজার বছর সে বেঁচেছে, রোদে ওর হাড়-মাস রক্ত-সব শুষে নিয়েছে, তারপর ধুলোর মত বাতাসে নিয়েছে উড়িয়ে। দেমাক বেশি হলে ভগবান তার কি করতে পারে দ্যাখ্!'

'বল না, কি করে ঘটল!' আমি বুড়ীকে অনুনয় করি, স্টেপিতে যেসব অদ্ভুত গল্প গজায় তারই একটা শোনবার আশায়।

বুড়ী গল্পটা বলেঃ

অনেক হাজার বছর আগের ঘটনা। সমুদ্রের ওপারে অনেক দূরে. যেখানে সূর্য ওঠে সেখানে আছে এক দেশ। তার মধ্যে মস্ত নদী. রোদ সেখানে কড়া, প্রতিটি গাছের পাতা, প্রতিটি ঘাস এত বড় যে মানুষের যতখানি ছায়া দরকার—সব তারা পায়।

'ওদেশের প্রকৃতি ত খুব উদার!'

'সেখানে এক জাতের মানুষ থাকত, তাদের গায়ে ছিল খুব জোর, গরু ভেড়া চরাত; যোয়ান বয়েস কাটিয়ে দিত, গতর খোয়াত—শিকার করে, শিকারের পরে উৎসব করে, গান গেয়ে আর মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে।

'এক দিন উৎসবেব মধ্যে আকাশ থেকে একটা ঈগল এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল একটা মেয়েকে, কালো চুলো সে মেয়েটা রাতের মত শান্ত। পুরুষরা ঈগলটার দিকে তীর ছুঁড়লে কিন্তু বেচারীদের তীরগুলি ঈগলকে বিঁধতে পারলে না, মাটিতে ফিরে এল। তারপর তারা বেরুলো মেয়েটার খোঁজে। অনেক খুঁজেও ফল হল না কিছু, পাওয়া গেল না মেয়েটাকে। তারপর সবাই ভুলে গেল তার কথা—দুনিয়ার সব কিছুই যেমন ভুলে যায় মানুষ।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে থেমে যায় বুড়ী। তার খনখনে গলার আওয়াজে বিস্মৃত সকল যুগের অভিযোগ বেজে ওঠে; ছায়াময় স্মৃতিতে সেই যুগগুলি বুড়ীর বুকের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। যে সব প্রাচীন উপকথা, হয় ত সাগর কূলেই রচিত হয়েছিল, তাদেরই একটা প্রারম্ভিক পর্বের সঙ্গে মৃদু সংগত্ করছিল সাগর।

'বিশ বছর পরে মেয়েটা নিজেই ফিরে এল, জীর্ণশীর্ণ ঝড়ো কাকের মত শরীর নিয়ে, সঙ্গে একটা ছোকরা, সুন্দর ও যোয়ান, বিশবছর আগে ঠিক যেমন ছিল মেয়েটা। সবাই শুধোল, কই ছিলি? মেয়েটা বললে, ঈগলটা তাকে নিয়ে গিয়েছিল পাহাড়ী দেশে। সেখানে তার বউ হয়ে ঘর করেছে। এই যোয়ানটা তার ছেলে। বাপ মরে গেছে। যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, শেষবারের মত উড়ে গেল আকাশে, তার পর ডানা গুটিয়ে ধপ্ করে পড়ল পাহাড়ের গায়, আর সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল।...

'সবাই হাঁ করে দেখলে ঈগলের ছেলেকে। কোন তফাৎ নেই এদের সঙ্গে, শুধু চোখ দুটোতে তার ঈগলের মতই দেমাক ভরা উদাসীন্য। ওরা কথা বলে, খুশি হলে ও জবাব দেয়, নয় ত চুপ করে থাকে। মোড়লরা যখন এসে ওর সঙ্গে কথা বলল, ও যেন তাদের সমান—এই ভাব দেখাল।

অপমান বোধ করে তারা গাল দিল ওকে, 'এখনো দাঁত গজায় নি, তবু মাড়ি দিয়ে কামড়াতে আসে !' ওকে জানিয়ে দেয়, ওর মত হাজার হাজার মানুষ, ওর দুনো বয়সের হাজার লোক পর্যন্ত এদের মান্য করে, কথা শোনে। কিন্তু ঈগলের বেটা বুক চিতিয়ে ওদের দিকে কটকট করে তাকায়। জবাব করে, তার নাকি কেউ জুড়ি নেই; অন্যে যদি মোড়লদের মেনেই থাকে, সে মানবে না তার জন্যে। কি ভীষণ রেগে গেল বুড়োরা। বললে, 'আমাদের মধ্যে ওর জায়গা নেই, যেখানে খুশি চলে যাক।'

'হো হো করে হেসে চলে গেল যেখানে খুশি—একটা সুন্দর মেয়ের কাছে: একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়েছিল মেয়েটা। ও এগিয়ে গিযে তাকে জড়িয়ে ধরল। যে সব মোড়লকে ও এই মাত্র গাল দিয়েছে তাদেরই একজনের মেয়ে ওটা। বাপের ভয়ে সুন্দর যোয়ান পুরুষ দেখেও তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ওকে ঠেলে দিয়ে চলে যাচ্ছিল মেয়েটা কিন্তু এক চড়ে ও তাকে শুইয়ে দিল। তারপর উঠে দাঁড়াল তার বুকের উপর। মেয়েটার মুখ দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠল, তারপর উঠল শ্বাস, সাপের মত শরীরটা মোচড়িয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

'এই কান্ড দেখে সবাই পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেল—এবকমভাবে কোন নারীহত্যা এই সমাজে এর আগে আর কখনো ঘটেনি। বেশ খানিক-ক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ওরা, একবার মাটির উপর মরা মেয়েটির দিকে তাকায়, চোখ দুটো তার খোলা, মুখে রক্তের দাগ; আর একবার তাকায় ছোকরাটার দিকে, মেয়েটার পাশে গর্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কোন লজ্জা নেই, কোন অনুশোচনা নেই, অপরাধ হয়েছে, শাস্তি দাও বলে মাথা নীচু করার কোন লক্ষণ নেই। লোকগুলোর যখন ঘোর কাটল তখন সবাই মিলে ওকে ধরলে। তারপর বেঁধে ফেলে রেখে দিলে সেখানে। ওরা ভাবে, ওকে ধরে ধপ্ করে মেরে ফেলা—সে ত সহজ ব্যাপার, তাতে ওদের মন তৃপ্তি পাবে না।'

রাতের অন্ধকার আরও ঘনিয়ে আসে, অদ্ভুত মৃদু শব্দে ভরে ওঠে চারদিক। স্টেপির উপরে বড় বড় পাহাড়ে ইঁদুরগুলো করুণ শব্দ করে. আঙুর ক্ষেতের পাতার মধ্যে ঝিঁঝিঁগুলো একটানা খন্‌খনে আওয়াজ

করতে থাকে। গাছের পাতাগুলো দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কানাকানি করে, রক্তের মত রাঙা পূর্ণিমার চাঁদ ক্রমে ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে আসে, নীলাভ কুয়াশা স্টেপির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।...

'অপরাধের যথাযোগ্য শাস্তি নির্ধারণের জন্য আবার সবাই জমায়েত হয়।...কেউ কেউ বলে, ঘোড়া লাগিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হোক ওর শরীরটা, কিন্তু এত সহজ শাস্তি কারুরই মনঃপূত হয় না। অন্য-প্রস্তাব হয়, সবাই একটা করে তীর ছুঁড়ে ওকে মারা হোক, কিন্তু সে প্রস্তাবও বাতিল হয়ে যায়। একজন বললে, ওকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হোক, কিন্তু তাও পছন্দ হল না, আগুনের ধোঁয়ায় ত দেখা যাবে না কি কষ্ট পাচ্ছে লোকটা। অনেক প্রস্তাব হল, কিন্তু একটাও পছন্দসই হল না। এমনি ভাবে যখন আলোচনা চলছে, ওর মা এসে নিঃশব্দে সবার সামনে নতজানু হয়ে বসে। ছেলের জন্য কৃপা প্রার্থনার মত ভাষা বা চোখের জল কিছুই সে খুঁজে পায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওদের আলোচনা চলতে থাকে। অগত্যা অনেক চিন্তা করে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলে ওঠেনঃ

'ওকে জিজ্ঞাসা করা যাক না, কেন একাণ্ড করলে!'

'ওরা জিজ্ঞাসা করে, সে জবাব দেয়ঃ

'বাঁধন খোল, বাঁধা অবস্থায় আমি কোন কথা কইব না!'

'বাঁধন খোলা হলে ও যে সুরে কথা বলতে শুরু করে, মনে হয় যেন ক্রীতদাসদের সঙ্গে কথা কইছেঃ

'কি চাও তোমরা?'

'তুমি শুনেছ—কি চাই,' জ্ঞানীব্যক্তি উত্তর করেন।

'আমি যা করেছি তার জন্যে তোমাদের কাছে জবাবদিহি করতে যাব কেন?'

'আমরা যাতে তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারি। শোন দর্পীশিরোমণি! তোমার মৃত্যু অবধারিত।... আমাদের বুঝিয়ে দাও কি করেছ। আমরা বেঁচে থাকব, আর বর্তমানে যা জানি তার চেয়ে বেশি কিছু জানা আমাদের কাজে আসবে।'

'বেশ, আমি তোমাদের বলব, অবশ্য আমি নিজেই ঠিকমত বুঝে

উঠতে পারছিনে—কি ঘটেছে। আমার মনে হয়, ওকে আমি হত্যা করেছি, ও আমায় প্রত্যাখ্যান করেছিল বলে।...আমি ওকে চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু ও ত তোমার নয়,' বললে একজন।

'যা তোমাদের শুধু তাই কি তোমরা ব্যবহার কর? আমি ত দেখছি, মানুষের নিজের বলতে আছে শুধু বাক্‌শক্তি, হাত পা...কিন্তু সে দখল করে বসেছে গরু ঘোড়া, নারী, জমিজমা. .আরো কত কি।'

"এর জবাবে ওকে বলা হল, 'মানুষ যা-কিছু অধিকার করে সব কিছুর জন্য সে নিজেকে দিয়ে মূল্য দেয়ঃ জ্ঞান দিয়ে, শক্তি দিয়ে, কখনো জীবন দিয়ে। ও জবাব করে, নিজেকে ও পূর্ণাঙ্গ রাখতে চায়।

"অনেকক্ষণ ধরে ওর সঙ্গে কথা কয়ে সবাই বুঝতে পারে এরাজ্যে নিজেকে ও সবার উপরে মনে করে, নিজের সম্বন্ধে ছাড়া আর কারুর সম্বন্ধে কোন চিন্তাই ওর নেই। নিজের উপর এমন একাকীত্বের দণ্ড কেমন করে মানুষ দিতে পারে, ভেবে ওরা ভয় পায়। ও কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়, ওর মা নেই, নিজের কোন পশুর পাল নেই, স্ত্রীও নেই—এ সব কিছু চায়ও না সে।

"সবাই যখন এ বিষয়ে অবহিত হয়, আবার আলোচনা শুরু হয় কি শাস্তি তাকে দেওয়া যেতে পারে। এবার আর দীর্ঘ তর্ক নয়, জ্ঞানী-ব্যক্তিটি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার কথা বললেন তিনিঃ

"থামো! আমি একটা শাস্তির কথা ভেবেছি, ভীষণ সে শাস্তি। হাজার বছর ধরে ভেবেও তোমরা সে শাস্তি বার করতে পারতে না। শাস্তি ওর নিজের মধ্যেই আছে। ওকে যেতে দাও, একেবারে ছেড়ে দাও। সেই হবে ওর শাস্তি!'

"সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। আকাশে বজ্রনির্ঘোষ শোনা যায়, অথচ মেঘ চোখে পড়ে না। জ্ঞানী ব্যক্তির প্রস্তাবের সমর্থন আসে স্বর্গীয় শক্তির কাছ থেকে, সবাই মাথা নীচু করে, তারপর যে যার চলে যায়। কিন্তু যুবক 'লা'রা বা সমাজতাড়িত' এই সংজ্ঞা লাভ করেও যারা ওকে ছেড়ে চলে গেল তাদের প্রতি অট্টহাস্য করে ওঠে। একা একাই ও হাসতে থাকে, ওর বাবারই মত মুক্ত, স্বাধীন। কিন্তু ওর বাবা ত মানুষ ছিল না, ও যে মানুষ, তাই পাখীর মতই স্বাধীন জীবন শুরু

হল ওর। বসতি অঞ্চলে হানা দিয়ে তাদের গরু ছাগল লুটে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় তাদের নারী, যখন যা খুশি। ওরা ওর দিকে তীর ছোঁড়ে, কিন্তু পরম শাস্তির অদৃশ্য বর্মে তার দেহ সুরক্ষিত, তাই তাব মৃত্যু ঘটে না। যেমন সে চতুর, তেমনি গৃধ্নু, যেমনি শক্তিমান, তেমনি নৃশংস। কিন্তু মানুষের সঙ্গে সে কখনো মুখোমুখি হয় না, দূর থেকে তাকে দেখা যায় শুধু। তাই সে একা একা মানুষের বসতির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, বহু দিন, বহুকাল, অনেক--অনেক বছর ধরে। একদিন সে বসতি-অঞ্চলের খুব কাছে এসে পড়ে। সবাই যখন ওকে ধরবাব জন্যে ছুটে আসে, ও কিন্তু পালিয়ে যায় না। আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে এমন লক্ষণও দেখা যায় না কিছু। ব্যাপার কি অনুমান করে একজন চীৎকার করে ওঠে ঃ

'ওকে স্পর্শ করো না, ও মরতে চায়!'

'সবাই সহসা থেমে দাঁড়ায়; যে তাদের এত ক্ষতি করেছে তাব দুর্ভোগ দূর করতে ওরা রাজী নয়, তাকে হত্যা করার কোন ইচ্ছা নেই ওদের। থেমে দাঁড়িয়ে ওরা সবাই মিলে ওকে শ্লেষ করতে থাকে। দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেই সব কটুকথা শোনে ও, মনে হয়, বুকের কাছে কি যেন খুঁজতে থাকে। হঠাৎ নীচু হয়ে একটা পাথর তুলে নেয়, তারপর লোকগুলোর দিকে তেড়ে আসে। ওর আঘাত এড়িয়ে যায় সবাই. কিন্তু ওকে আঘাত করে না। অগত্যা হতাশায় অবসন্ন হয়ে চীৎকাব করে ও মাটিতে পড়ে যায়। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে। ধস্তা-ধস্তির সময় একটা লোকের হাত থেকে একখানা ছুরি পড়ে গিয়েছিল, সেই ছুরিটা হাতে নিয়ে ও খাড়া হয়, তারপর নিজের বুকের উপব বসিয়ে দেয় ছুরিটা। কিন্তু মট করে ভেঙে যায় ছুরিটা, যেন পাথরে ঘা লেগেছে। আবার গড়িয়ে পড়ে। মাথা কুটতে থাকে মাটির উপব' কিন্তু মাটি সে আঘাত সহ্য করে নেয়। এখানে সেখানে কয়েকটা গর্ত হয়ে যায় শুধু।

'ও মরতে পারছে না,' সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে সবাই।

"ওকে ফেলে রেখে যে-যার চলে যায়। উপরের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকে লা'রা। চোখে পড়ে বিরাট বিরাট ঈগল আকাশে অনেক

উঁচুতে চরে বেড়াচ্ছে—কালো বিন্দুর মত ভাসছে সেগুলি। এমন তিক্ততায় ভরে ওঠে ওর চোখ, যেন সারা দুনিয়ার সমস্ত অধিবাসীকে বিষিয়ে দিতে পারে। সেই থেকে একা রয়েছে লা'রা; একা, স্বাধীন, মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষমান। সেই থেকে ও এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সর্বত্র বিচরণ করছে। দেখছে কি? এরই মধ্যে ছায়ার মত হয়ে গেছে ও, আর এমনিই থাকবে চিরদিন। মানুষের ভাষা, তার ক্রিয়াকলাপ বুঝতে পারে না, কিছুই বোঝে না ও। কিছু করেও না। শুধু ঘুরে বেড়ায়—কি যেন খুঁজছে।...জীবনকে ও জানে না, মৃত্যুও ওর প্রতি প্রসন্ন হয় নি। মানুষের মধ্যে ওর স্থান নেই।...এমনি করেই দর্পীর শাস্তি হয়েছে!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বুড়ী চুপ করে; মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছিল, অদ্ভুতভাবে সে মাথা নাড়তে থাকে।

আমি বুড়ীর দিকে তাকাই, মনে হয় যেন ঘুমে ধরেছে তাকে। কেন যেন বড় দুঃখ বোধ হল ওর জন্য। স্পর্ধাভরা তিরস্কারের সুরে বুড়ী তার গল্প শেষ করেছে। তবু তার সুরের মধ্যে কেমন একটা হীন গোপনতার চেষ্টা ধরা পড়ে। সমুদ্রতীরের লোকগুলি গান শুরু করে দেয়, অদ্ভুত সে গান। প্রথম খাদে সুর শোনা যায়। সেই সুরে দু-তিন কলি গাওয়া হলে পর আর একক কণ্ঠস্বর শুরু থেকে গাইতে আরম্ভ করে। প্রথম কণ্ঠস্বরও চলতে থাকে।...তার পর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমকণ্ঠ গান ধরে একজনের পর একজন। হঠাৎ পুরুষ কণ্ঠের ঐক্য-তানে আবার প্রথম থেকে গানটা শুরু হয়।

মেয়েদের গলাও শোনা যায়। প্রতিটি কণ্ঠস্বর আলাদা বোঝা যায়। সম্মিলিত কণ্ঠস্বর মনে হয় যেন রামধনু রঙের পাহাড়ী ঝরনা—পাথরে পাথরে হোঁচট খেয়ে চলছে। পুরুষকণ্ঠের ঐক্যতান উপরের দিকে ছুটেছে, নারীকণ্ঠ থেকে পৃথক। আর তারই সংগে মিশবার জন্য লাফ দিয়ে অট্টহাস্যে পড়ছে এসে নারীকণ্ঠের স্রোত। পুরুষকণ্ঠ ডুবিয়ে দিচ্ছে তাকে। সজোরে লাফিয়ে উঠছে একটার পর একটা—যেমন জোরালো, তেমনি ঝরঝরে।

এই কণ্ঠস্বরে সমুদ্রের আওয়াজ আর শোনা যায় না।

দুই

"এই ধরনের গান আর কোথাও শুনেছ কি?" ইজেরগিল আমাকে জিজ্ঞাসা করে; মাথাটা উঁচু করে হাসতে থাকে, ওর ফোগলা মাড়িগুলি বেরিয়ে পড়ে।

"না, শুনি নি। এ ধরনের সুর কোথাও শুনিনি কোনদিন।..."

"শুনবেও না কখনো। আমরা খুব গান ভালবাসি। সুন্দর মানুষই ভাল গাইতে পারে, সুন্দর মানুষ—যারা জীবনকে ভালোবাসে। আমরা ভালোবাসি জীবনকে। দিনের কাজের শেষে ক্লান্ত লোকগুলোই কি ওখানে গান গাইছে না? সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খেটেছে ওরা, আর যেই চাঁদ উঠেছে, অমনি গান শুরু করে দিয়েছে! যারা বাঁচতে জানে না, তারা শুয়ে পড়ে, কিন্তু জীবনে যারা আনন্দ পায় তারা গান করে।"

"কিন্তু স্বাস্থ্য? ." আমি বলতে শুরু করি।

"বাঁচার মত প্রচুর স্বাস্থ্য সবারই আছে। স্বাস্থ্য! তোমার যদি টাকা থাকত, তুমি খরচ করতে না কি? স্বাস্থ্যও তাই। জান, যৌবন-কালে আমি কি করতাম? সূর্যোদয় থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত বসে কার্পেট বুনতাম, একবারও উঠতাম না বলা চলে। সূর্যরশ্মির মতই প্রাণময় ও চঞ্চল ছিলাম আমি। তবু সারাদিন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে হত, সমস্ত হাড়গুলো পর্যন্ত ব্যথা হয়ে যেত। কিন্তু রাত্রি আশার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটে যেতাম আমার প্রাণের মানুষের কাছে, তাকে আলিঙ্গন ও সোহাগ করার জন্য। যে কদিন ভালোবাসা ছিল, পুরো তিনমাস এই করেছি, প্রতিটি রাত কাটিয়েছি তার সঙ্গে। তবুও আজ পর্যন্ত বেঁচে আছি—অনেক রক্ত ছিল ধমনীতে, নয় কি? কত ভালোবেসেছি! কত চুম্বন দিয়েছি ও নিয়েছি!.."

আমি ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকাই। ওর কালো চোখ-দুটো নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে, পুরনো স্মৃতি কোন দীপ্তিই সঞ্চার করেনি তাতে। চাঁদের আলো পড়ে ওর মুখে, শুকনো ফাটা ঠোঁটে, ছুঁচোলো থুতনিটায়, পাকা চুলে, পেঁচার ঠোঁটের মত দোমড়ানো নাকটায়। গালের

গর্তগুলো অন্ধকার, মুড়ি দেওয়া লাল কম্বলটার ফাঁক দিয়ে একগাছি পাকা চুল এসে পড়েছে গালের গর্তের অন্ধকারে। তার মুখ, গলা, হাত—সব কুঁকড়ে গিয়েছে, যতবার ও নড়ে ওঠে, আমার আশংকা হয়, শুকনো চামড়াটা বুঝি চড়্ চড়্ করে ফেটে ঝর ঝর করে খসে পড়বে, আর আমার চোখের সামনে থাকবে একটা শূন্য কঙ্কাল, আর দুটো নিষ্প্রাণ কালো চোখ।

খনখনে গলায় বুড়ী আবার বলতে শুরু করেঃ

"বিরলাট নদীর তীরে ফল্মার কাছে মার সঙ্গে থাকতাম। আমার বয়স যখন পনেরো, তখন সে প্রথম আসে আমাদের খামারে। দীর্ঘকায় মোহন চেহারা, মুখে কালো গোঁফ, আর কি আমুদে লোক! নৌকোয় ছিল সে। ঝঙ্কার দিয়ে হেঁকে ওঠে--যাতে জানলার ভিতর দিয়ে আমরা শুনতে পাই। 'ওহে, মদ আছে তোমাদের ঘরে?...খাবার কিছু?' আমি বাইরে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি। আশফল গাছটার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলোয় নীল নদীটা চোখে পড়ে। আর দেখি, সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, গায়ে তার সাদা পোশাক, চওড়া কোমরবন্ধের দুটো দিক একপাশে ঝুলছে। এক পা নৌকোয়, আর এক পা তীরে রেখে দুলে দুলে আপন মনে গান গাইছে। আমাকে দেখেই বলে ওঠে, 'আরে খাসা মেয়ে থাকে ত এখানে!..আর আমি জানি না!' যেন 'আমি' ছাড়া দুনিয়ার আর সব খাসা মেয়ের খবরই ওর জানা ছিল। ওকে খানিকটা মদ দিলাম আর কিছু সেদ্ধ শুয়োরের মাংস।...চার দিন বাদে নিজেকেও দিলাম সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে। এক সঙ্গে রাত্রিতে নৌকো বাইতে যেতাম। সে আসত, পাখীর মত মৃদু শিস দিত, আর আমি জানলা দিয়ে মাছের মত নদীতে লাফিয়ে পড়তাম। তারপর দুজনে চালিয়ে দিতাম নৌকো—দূরে, আরো দূরে। প্রুটে মাছ ধরার কাজ করত ও। পরে যখন মা সব কথা জানতে পারলেন, আর বেদম মারলেন আমাকে, তখন ওর সঙ্গে দব্রুজা বা দানিউবের শাখা ধরে আরও অনেক দূরে পালিয়ে যাওয়ার জন্য উস্কালো আমাকে। কিন্তু ততদিনে আমার প্রেম ছুটে গিয়েছে—ও যে শুধু গান আর চুমো খায়, আর কিছু করে না! আমার ক্লান্তি এসে গিয়েছে,

বিরক্ত হয়ে পড়েছি। সেই সময় একদল হুজুলীয়ান ওই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর তাদের প্রেমিক-প্রেমিকাও জুটেছিল সেখানে।...মজায় সময় কাটছিল মেয়েগুলোর! কোন মেয়ে তার কার্পাথিয়ান প্রিয়তমের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করে থাকত। ভাবত, কি হল লোকটার, কোথাও বন্দী হয়ে রইল, না, লড়াইয়ে মারা পড়ল কোথাও? হঠাৎ লোকটা এসে হাজির হয়, যেন আকাশ থেকে পড়েছে। হয়ত একা, হয়ত বা দু-তিন জন সংগে নিয়ে। অনেক দামী উপহার সংগে নিয়ে আসে মেয়েটার জন্য—দামী জিনিস ওদের সহজেই জুটে কি-না। তারপর মেয়েটার বাড়ীতে চলে ভোজের পালা, আর সাথীদের কাছে চলে ছুঁড়ির স্তুতিগান। খুব খুশি হয়ে যায় মেয়েটা। আমি অনু-রোধ করেছিলাম এক বান্ধবীকে ওদের দেখাবার জন্য, বান্ধবীটিরও হুজুলীয়ান প্রেমিক ছিল।...কি যেন ছিল মেয়েটার নাম? ভুলে গেছি। ...সবই ভুলে যাচ্ছি আজকাল। কতদিন আগের কথা, ভুলে যে গেছি তাতে আর আশ্চর্য কি! একটা ছোকরার সংগে আলাপ করিয়ে দিয়ে-ছিল বান্ধবী। কি সুন্দর চেহারা তার!...লাল চুল, লাল গোঁফ—সব লাল! কি মেজাজ! কিন্তু কি বিষণ্ণ দেখাত তাকে! মাঝে মাঝে কি কোমল মনে হত, কিন্তু অন্য সময়ে সে লড়াই করত আর হুংকার দিত যেন একটা হিংস্র পশু। একবার এক চড় মেরেছিল আমার গালে। ...আমিও বেরালের মত লাফ দিয়ে পড়েছিলাম ওর উপর, দাঁত বসিয়ে দিয়েছিলাম ওর গালে। সেই থেকে ওর গালে টোল পড়ে যায়। আর সেই টোলের উপর আমার চুমো খাওয়াতে কত আনন্দই না হত তার।...

"কিন্তু তোমার ধীবরপ্রবরের কি হল?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"জেলেটা? ওঃ সে...সে হুজুলীয়ানদের দলে যোগ দিলে। প্রথম প্রথম তার সংগে যাওয়ার জন্য আমাকে অনেক অনুনয় বিনয় করলে, তারপর ভয় দেখাল, সংগে না গেলে আমাকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, কিন্তু কয়েকদিন পরেই সে আমাকে ছেড়ে দিলে। দলে যোগ দিয়ে আর একটা মেয়ে জুটিয়ে নিয়েছিল সে...। তাদের দুজনের একসংগে ফাঁসি হয়—সেই জেলে, আর একটা ছেলে। আমি দেখতে গিয়েছিলাম সে ফাঁসি। ডবরুজায়। জেলেটা ফাঁসি কাঠে উঠল কাঁদতে কাঁদতে,

মড়ার মত শিটে মেরে গিয়েছিল আগে থেকেই, কিন্তু অন্য ছেলেটা স্থিরভাবে পাইপ টানছিল। পকেটে হাত দিয়ে পাইপ টানতে টানতে সে এগিয়ে গেল। গোঁফের একদিকটা কাঁধের উপর রাখা, অপর দিকটা বুকের উপর ঝুলছিল। সে আমায় দেখতে পেলে। মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে নিয়ে হেঁকে উঠল, 'চললাম...' আমি পুরো এক বছর ওর জন্যে দুঃখ করেছি। এ্যাঁঃ...এঘটনা ঘটেছিল ওরা কার্পেথিয়ায় বাড়ী রওনা হওয়ার ঠিক মুখে মুখে। এক রুমানিয়ানের বাড়ীতে বিদায়ী ভোজের আয়োজন হয়, আর সেখানেই ওরা ধরে পড়ে। দুজন শুধু ধরা পড়েছিল। কতকগুলো মারা যায়, বাকিগুলি যায় পালিয়ে। ..তা বলে রুমানিয়ানদের উপর শোধও তুলেছিল ওরা কড়ায় গণ্ডায়।...ওদের বাড়ী, ক্ষেত, হাওয়া-কল, সব পুড়িয়ে দিয়েছিল। ভিখিরি হয়ে গেল লোকটা তারপর।"

"তুমি করেছিলে কিছু?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"ওই হুজুলীয়ানদের অনেক বন্ধু ছিল, আমি একা নই। যারাই ওদের সত্যিকারের বন্ধু ছিল, সবই মৃতের জন্য প্রার্থনা করেছিল এইভাবে।..."

সাগরবেলায় সঙ্গীত এতক্ষণ থেমে গেছে, একমাত্র গর্জমান সাগরের শব্দই বুড়ীর গলার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গত করছে। সেই উদাত্ত অশান্ত শব্দই অশান্ত এই জীবনকাহিনীর সঙ্গে অনবদ্য ঐক্যতান রক্ষা করতে পারে। রাত ক্রমশ হালকা হয়ে আসে, চাঁদের ম্লান আলোয় কিছুটা উজ্জ্বল দেখায়, রাত্রের অদৃশ্য অধিবাসীদের অশান্ত জীবনের রহস্যময় শব্দগুলি ক্রমশ মিলিয়ে যায়, ঢেউয়ের বর্ধমান শব্দে ডুবে যায় সেগুলি...জোর বাতাস উঠতে শুরু করেছে কি-না।

"সেখানে এক তুর্কি ছিল, তারও প্রেমে আমি পড়েছিলাম। তার হারেমে বাস করেছিলাম স্কুটারিতে। পুরো এক হপ্তা ছিলাম সেখানে। মন্দ ছিলাম না।...কিন্তু বিরক্তি এসে গেল।...মেয়েমানুষ আর মেয়েমানুষ, আর কিছু নয়...। আটজন ছিল তার...। সারা দিন তারা শুধু খেত, ঘুমোত আর আবোলতাবোল বকে যেত...। নয়ত ঝগড়া করত, মুরগির মত কোঁ কোঁ করে উঠত একজন আর একজনকে...।

সেই তুর্কিপ্রবর তখন তরুণ নয়। চুলে বেশ পাক ধরেছে, কি জাঁকালো তাকে দেখতে! পয়সাও খুব। কথা বলত পাদরির মত। চোখদুটো কালো...সোজা তোমার দিকে তাকাবে..একেবারে মর্মভেদ করে। প্রার্থনায় তার খুব উৎসাহ। প্রথম তাকে আমি দেখি বুখারেস্টে... বাজারে। হেঁটে বেড়াচ্ছিল রাজার মত—যেন কত বড় কেউকেটা ব্যক্তি। আমি হেসে ফেললাম ওর দিকে চেয়ে। সেইদিনই সন্ধ্যায় পথ থেকে ধরে আমায় নিয়ে যাওয়া হল ওর বাড়ীতে। সে ছিল সওদাগর, চন্দন ও দেবদারুর কারবার করত। বুখারেস্টে এসেছিল সওদা করতে। 'আমার সঙ্গে আসবে?' সে জিজ্ঞাসা করলে। 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!' 'তোফা!' আমি ওর সঙ্গে চলে গেলাম। তুর্কিটা পয়সাওয়ালা ছিল। একটা ছেলে ছিল তার—শ্যামবর্ণের ছোট ছেলে, কি মিষ্টি চেহারা...! বয়স তার বছর ষোল। তারই সঙ্গে পালিয়েছিলাম আমি তুর্কীটার কাছ থেকে...পালিয়ে বুলগেরিয়া যাই, লোম-পালঙ্কয়...। সেখানে এক বুল-গেরিয়ান মাগী আমার বুকে ছুরি মেরেছিল, তার নাগরের জন্য, কি স্বোয়ামীর জন্য—ভুলে গেছি।

"অনেক দিন এক আশ্রমে অসুখে পড়ে রইলাম। একটা পোলিশ মেয়ে আমার সেবা করেছিল। তার ভাই ছিল একটা, আর্জার-পালঙ্ক-র কাছে এক মঠে সাধু ছিল সে। মাঝে মাঝেই বোনকে দেখতে আসত। পোকার মত ক্যাতরাতে শুরু করত আমার সামনে...সেরে উঠে তার সঙ্গে চলে গেলাম তার দেশে পোল্যাণ্ডে।

"একটু থেমে! বাচ্চা তুর্কিটার কি হল?"

"ছেলেটা?—মরে গেল। বাড়ীর কথা ভেবে, না পিরীতের জ্বালায় —জানি না। শুকিয়ে গেল, নতুন চারায় কড়া রোদ লাগলে যেমন হয়...শুধু শুধু শুকিয়ে গেল...আজো যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাকে —শুয়ে আছে স্বচ্ছ নীলচে এক খণ্ড বরফের মত; কিন্তু পিরীতের আগুন তখনো ওর মধ্যে জ্বলছে। ঝুঁকে পড়ে চুমো দেওয়ার জন্য অনবরত সেধেছে আমাকে...আমি ভালবাসতাম ওকে. মনে পড়ে, কত চুমো দিয়েছি...। তারপর অবস্থা খুব খারাপ হল, নড়তেই প্রায় পারে না, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাতর প্রার্থনা জানাতে

লাগল আমাকে, ভিখিরী ভিখ্ মাঙছে যেন, পাশে শুয়ে ওকে একটু গরম করে দাও। আমি তাই করলাম। যখনই ওর কাছে গিয়েছি, আগুনের মত গরম হয়ে উঠেছে ও। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি, ও ঠান্ডা মেরে গেছে...মরে গেছে...। কাঁদলাম খানিকটা ওর দুঃখে: কে বলতে পারে? হয়ত আমিই ওকে মেরেছি। ওর দুনো বয়স তখন আমার—যেমন আমার শক্তি, তেমনি তেজ। আর ও ত নেহাৎ খোকা!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বুড়ী। আর এই তাকে প্রথম দেখলাম বুকের উপর হাত দিয়ে তিনবার ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিতে। শুক্‌নো ঠোঁটে বিড়বিড় করে কি যেন বলেও গেল।

"তাহলে তুমি ওর সঙ্গে পোল্যান্ডে গেলে?" আমি উস্কে দিই।

"হ্যাঁ, সেই ক্ষুদে পোলটার সঙ্গে। সেটা একটা হীন ও ঘৃণ্য জীব। যখন তার বাই জাগত, আমার কাছে ঘেঁষে আসত পোষা বেরালটার মত, আর ঠোঁট দিয়ে কথার ধারা বইত—যেন গরম মধু ঝরছে। কিন্তু আমাকে যখন ওর দরকার নেই তখন আমার দিকে দাঁত খিঁচোত আর কথা যা বলত—যেন চাবুকের শব্দ, কেটে বসবে। একদিন নদীর ধারে দুজনে হাঁটছি, ও বেয়াড়া হয়ে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে বসল। ওঃ, আমি ক্ষেপে গেলাম, গরম পিচের মত টগবগ করতে লাগলাম রাগে। শিশুর মত দুহাতে তুলে নিলাম ওকে—লোকটা আকারে ছিল নেহাৎ ছোট—দুহাতে ধরে দুপাশে এমন চাপ দিলাম যে ওর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপর পাক ঘুরিয়ে দিলাম নদীর জলে ছুঁড়ে। আর্তনাদ করে উঠল। এমন মজা লাগছিল শুনতে। অবজ্ঞাভরে একবার চোখ নীচু করে দেখলাম—জলের মধ্যে হাত-পা ছুঁড়ছে সেটা। তারপর সরে গেলাম সেখান থেকে। এরপর আর তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। বরাত ভাল, যাদের সঙ্গে মন মজিয়েছি তারপর আর তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। এরকম দেখা হওয়া মোটেই সুখের নয়—যেন মরা মানুষের দেখা পাওয়া।

কথা বন্ধ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বুড়ী। যাদের ও পুনরুজ্জীবিত করেছিল সেই লোকগুলোকে আমি মানস চক্ষে একবার দেখে নিই। আগুনের মত লালগুঁফো হুজুলীয়ান মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে, পাইপ

টানতে টানতে, হয়ত তার চোখ দুটো নীল হিমশীতল—সব কিছুর দিকে ও তাকাত অবজ্ঞাভরে, কঠিন ও স্থির দৃষ্টিতে, তারই পাশে কালো গোঁফওয়ালা প্রুট-এর ধীবরপ্রবর কাঁদছে, মরতে রাজী নয়। মৃত্যুর আশঙ্কায় মুখ বিবর্ণ, তার আনন্দোজ্জ্বল চোখদুটো নিষ্প্রাণ, তার চোখের জলে ভেজা গোঁফজোড়া বাঁকা ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে ঝুলছে। আর সেই বুড়ো চটকদার তুর্কি, হয়ত সে অদৃষ্টবাদী ও স্বৈরাচারী, আর তারই পাশে তার ছেলে প্রাচ্যদেশের বিবর্ণ কোমল একটি ফুল, চুম্বনের বিষে জর্জর, আর সেই আত্মম্ভরী পোল, বিনয়ী এবং নির্দয়, বাকপটু এবং হৃদয়হীন...। সবাই আজ নিষ্প্রাণ ছায়া মাত্র, আর যাকে এরা আলিঙ্গন করেছিল সে জীবন্ত আমার পাশে বসে, কালের গতিতে শুকিয়ে কুঁকড়ে গিয়েছে, দেহ নেই, রক্ত নেই, নেই হৃদয়ে কোন কামনা, চোখে জীবনের দীপ্তি পর্যন্ত নেই—সেও ত ছায়াবিশেষ।

বুড়ী আবার বলতে শুরু করেঃ

"পোল্যাণ্ডে আমি বড় কষ্ট পেয়েছি। সেখানকার লোকগুলো হৃদয়হীন ও মিথ্যাচারী, তাদের সাপের ভাষা আমি বুঝতে পারিনি। কথা বলার সময় ওরা ফোঁশ ফোঁশ করে...কেন করে জান? তারা মিথ্যাচারী বলে ভগবান তাদের সাপের ভাষা দিয়েছে। সেদেশে আমি নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম, কোথায় চলেছি জানতাম না; কিন্তু আমি দেখলাম, রুশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য তৈরি হচ্ছে তারা। বোখ্‌নিয়া শহরে এসে পৌঁছলাম। একটা ইহুদি আমায় কিনে নিলে। নিজের জন্যে নয়, আমার দেহ নিয়ে ব্যবসা করবে বলে। আমি রাজী হলাম তাতে। বেঁচে থাকতে হলে সবাইকেই কিছু না কিছু করতে হবে। আমি কিছুই করতে পারতাম না, তাই দেহের বেসাতী দিয়ে মূল্য দিতে হল। কিন্তু মনে মনে ভাবলামঃ বির্‌লাট-এ আমার বাড়ী ফিরে যাওয়ার মত যথেষ্ট পয়সা হলেই আমি শিকল ছিঁড়ে ফেলব, যতই শক্ত হোক না সে শিকল। কি জীবন কাটিয়েছি সেখানে! পয়সাওয়ালা বাবুরা আসত আমার বাড়ীতে আর হর্‌রা করত। আমি বলতে পারি, বেশ কিছু খরচ হত তাদের। আমাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই

চলতে চলতে তাদের সর্বনাশ ঘটত। তাদের মধ্যে একজন আমাকে পাওয়ার জন্য অনেকদিন ধরে চেষ্টা করলে, কি করলে জান? একদিন ত এল আমার ঘরে, সঙ্গে এল চাকর, চাকরের হাতে ব্যাগ। বাবুটি চাকরের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে খুলে ঢেলে দিলে আমার মাথায়। ব্যাগটা থেকে সোনার মোহর ঝরতে লাগল। মাথায় লাগল আমার, কিন্তু মাটিতে পড়ে সেগুলো যে ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ করতে লাগল, কি মিষ্টি লাগল আমার কানে। এত সত্ত্বেও লোকটাকে তাড়িয়ে দিলাম আমি। লোকটার মোটা তেলামুখ তাকিয়ার মত ভুঁড়ি। দেখতে যেন কুঁদো শুয়োরটা। হ্যাঁ, তাড়িয়েই দিয়েছিলাম; যদিও ও বলেছিল আমাকে আমার মাথায় মোহর বৃষ্টি করবার জন্য সব জমিজমা, বাড়ীঘর, ঘোড়া বিক্রী করে দিয়েছে। সে সময় আমার মন মজিয়েছিল একজন, মানুষের মত মানুষ। মুখময় তার দাগ, এধার থেকে ওধার থেকে দাগে কাটাকাটি হয়ে গেছে, তুর্কি'রা আঘাত দিয়েছিল তাতে। গ্রীকদের হয়ে তুর্কিদের সঙ্গে ও তখন লড়াই করছে। একে বলি মানুষ! লোকটা জাতে পোল, গ্রীকদের নিয়ে ও মাথা ঘামাবে কেন? তবুও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করতে এসেছিল, মুখে চাবুক মেরেছে, একটা চোখ গিয়েছে, বাঁহাতের দুটো আঙুলও গিয়েছে..। লোকটা ত পোল, গ্রীকদের নিয়ে তবু ও মাথা ঘামায় কেন? কারণ জান? সে বীরত্বকে শ্রদ্ধা করত, আর বীরত্বকে যে শ্রদ্ধা করে বীরত্ব দেখাবার সুযোগও খোঁজে সে। জীবনে বীরত্ব দেখাবার সুযোগ হামেশাই আসে, জানই ত। আর যারা সে সুযোগ পায় না, তারা নিছক কুঁড়ে নয়ত কাপুরুষ, অথবা তারা জানেই না, জীবন কি। জীবন কি তা যদি লোকে জানত তা হলে সবাই চাইত চলে যাওয়ার আগে যাতে ছায়া রেখে যেতে পারে। জীবন তাহলে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যেত না কোন দিন...ও, মুখে দাগওয়ালা সেই লোকটা সত্যি ভাল মানুষ ছিল, কাজের মত কাজ করবার জন্য সে পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত যেতে রাজী ছিল। আমার মনে হয়, বিদ্রোহের সময় তোমরা লোকটাকে মেরে ফেলেছ। ম্যাজিয়ারদের সঙ্গে লড়াই করতে কেন গিয়েছিলে? বেশ, বেশ, কিছু বলতে হবে না।"

আমাকে কিছু না বলবার আদেশ করে বুড়ী ইজেরগিল নিজে চুপ করে যায়, তারপর ডুবে যায় চিন্তায়। কিছুক্ষণ বাদে আবার বলে চলেঃ

"আমিও একজন ম্যাজিয়ারকে জানতাম। একদিন সে আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল- শীতের দিনে—লোকটাকে বসন্তকালেই দেখা যেত, বরফ গলে উঠলে, তাকে পাওয়া গেল মাঠের মধ্যে মাথায় গুলীবিদ্ধ অবস্থায়। কি হয়েছিল বল দেখি? দ্যাখো, মহামারিতে যত লোক মরে পিরীতিতে তার চেয়ে কম লোক মরে না। গুণে যদি দ্যাখো, তাহলেই বুঝতে পারবে কি যেন বলছিলাম? পোল্যাণ্ডের কথা.. হ্যাঁ, আমার শেষ খেল্ সেখানেই খেলেছিলাম। এক জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় দেখতে সুন্দর ছিল কি-না? একেবারে শয়তানের মত সুন্দর। আমি ত তদ্দিনে বুড়ী হয়ে গেছি বুড়ী বই-কি! বয়েস চল্লিশ হবে? হাঁ, তাই ত মনে হচ্ছে . লোকটার তখনো দেমাক রয়েছে, তবু আমরা মেয়েরা বিগড়ে দিতে পারি তাকে। তাকে হাত করতে আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে . হ্যাঁ। ও আমাকে চেয়েছিল আর পাঁচটা ফাল্‌তু মেয়েমানুষের মত, কিন্তু আমি তাতে রাজী হওয়ার পাত্রী নই। কারুর কাছে কখনো নিজেকে বিকিয়ে দিইনি। তখন সেই ইহুদিটার সঙ্গে ঘর বেঁধেছি, অনেক টাকা দিয়েছি তাকে, ক্রেকাউয়ে বসবাস শুরু করেছি। তখন আমার সব আছে- ঘোড়া, সোনাদানা, ঝি-চাকর .। সে আসত আমার কাছে একটা দানবের দেমাক নিয়ে, ইচ্ছে, আমি ছুটে গিয়ে তার বুকে লুটিয়ে পড়ি। ঝগড়াঝাঁটি চলল . । মনে আছে তার জন্যে আমার চেহারা পর্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। বেশ কিছু-দিন চলল এই অবস্থা. .কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমারই হল জয়। হাঁটু গেড়ে ভিক্ষা চাইতে হল ওকে. .কিন্তু আমাকে গ্রহণ করার পরেই ত্যাগ করলে। এবার বুঝলাম, আমি বুড়ী হয়ে গিয়েছি .ওঃ সে কথা ভাবতে মন আমার বিষিয়ে গেল! ওঃ কি বিষ! দ্যাখ, শয়তানটাকে ভালোবেসেছিলাম আমি যখন দেখা হত, ও আমায় টিটকিরি দিত .. কি নীচ! অন্যের কাছে পর্যন্ত ঠাট্টাতামাসা করত আমায় নিয়ে। আমি জানতাম তা। শুনতে খুব কষ্ট হত, বলছি তোকে। কিন্তু ওকে আমি কাছে রাখতাম, সব সত্ত্বেও ভালো বাসতাম। তোদের রুশদের

সঙ্গে যুদ্ধ করতে যখন চলে গেল, ওর বিরহ অসহ্য হল আমার। মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করলাম, পারলাম না...শেষ পর্যন্ত ওর কাছে যাব ঠিক করে ফেললাম। ওয়ারশ'র কাছে জঙ্গলের মধ্যে তখন ওদের ঘাঁটি।

"কিন্তু সেখানে পেঁছে দেখলাম, তোদের দল ওদের হারিয়ে দিয়েছে...আর সে বন্দী হয়ে আছে এক গ্রামে।

"তাহলে আর ওকে দেখতে পাব না, মনে মনে ভাবলাম। ওঃ, কিন্তু তাকে দেখার জন্য আমার মনে তখন কি ভীষণ আগ্রহ! কাজেই আমি চেষ্টা করলাম ওর কাছে যেতে, ভিখারীর পোশাক পরলাম, খোঁড়া সাজলাম, মুখ বেঁধে সেই গাঁয়ে গিয়ে হাজির হলাম। কসাকে আর সৈন্যদলে সে গাঁ তখন গিস্ গিস্ করছে...অনেক হুজ্জৎ করতে হল সে গাঁয়ে যেতে। পোলরা কোথায় রয়েছে, খুঁজে বার করলাম। বুঝতে পারলাম, সেখানে পেঁছন সহজ নয়। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে যে! তাই এক রাত্রে আমি গুটি গুটি রওনা হলাম সেদিকে ; একটা সবজির ক্ষেতের ভিতর দুই আলের মাঝখানকার নালার মধ্যে দিয়ে চলেছি, হঠাৎ এক শান্ত্রী এসে আমার পথ রুখে দাঁড়াল...আমি কিন্তু তখন শুনতে পাচ্ছি, পোলেরা গলা ছেড়ে গান গাইছে আর চেঁচিয়ে কথা কইছে। তারা তখন মায়ের নাম গাইছে, আমার আরাডেক-এর গলা আমি তখন শুনতে পাচ্ছি। মানুষ যখন আমার কাছে নুইয়ে পড়ত, কি বিশ্রী লাগত আমার : কিন্তু আমি তখন চলেছি মাটিতে হামা দিয়ে সাপের মত—একটা লোকের জন্য, হয়ত মৃত্যুর দিকেই গড়িয়ে চলেছি। আমার শব্দ পেয়ে সান্ত্রীটা এগিয়ে এল। কি করি? মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালাম, এগিয়ে গেলাম তার দিকে। আমার কাছে না আছে ছোরা, বা আর কিছু, আছে শুধু দুটো হাত, আর জিভটা। সঙ্গে ছোরা আনিনি বলে আপসোস হল। ফিসফিস করে বললাম, দাঁড়াও! লোকটা কিন্তু সঙ্গীন উঁচিয়ে ধরল আমার গলার কাছে। আবার বল-ল্যম তাকে ফিসফিস করেঃ 'আমাকে মের না, থাম, আমার কথা শোন. মন বলে যদি কিছু থাকে তোমার! তোমাকে দেওয়ার মত আমার কিছুই নেই, কিন্তু ভিক্ষা চাইছি...' বন্দুকটা নামিয়ে সেও আমায় ফিস

ফিস করে বললেঃ 'চলে যা বেটি, চলে যা! কি চাস এখানে?' আমি তাকে বললাম, আমার ছেলে এখানে বন্দী হয়ে আছে। বুঝতে পার সৈনিক—ছেলে! তোমারও মা আছে। নেই কি? আমার দিকে তাকাও তাহলে—তোমার মতন এক ছেলে আছে আমার, ওইখানে আছে সে। একবার তাকে দেখতে দাও। হয়ত দুদিনেই সে মরে যাবে.. আর তুমিও হয়ত মরবে কাল। তোমার মা তোমার জন্য কাঁদবে না? মাকে না দেখে মরতে ব্যথা লাগবে না তোমার মনে? আমার ছেলেরও তাই। নিজের কথা ভেবে দয়া কর, ওর প্রতি দয়া কর, দয়া কর আমাকে—মাকে!'

"ওঃ কতক্ষণ যে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম! বৃষ্টি পড়ছিল, ভিজে জবজবে হয়ে গেছি দুজনে। দারুণ জোরে বাতাস বইছে, শব্দ হচ্ছে শোঁ শোঁ করে, ধাক্কা মারছে আমাকে, কখনো বুকে কখনো পিঠে। টলতে টলতে দাঁড়িয়ে আছি ওই পাষাণ হৃদয় সৈনিকটার সামনে; ও কিন্তু একই সুরে বলে চলেছে, 'না, না।' যতবার ওই নির্মম না শব্দটা শুনছি, আমার আরাডেককে দেখবার বাসনা মনের মধ্যে ততই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। কথা বলবার সময় সৈনিকটাকে ভালো করে পরখ করে নিলাম—লোকটা রোগা বেঁটে, কাশছিল। ওর পায়ের কাছে মাটিতে বসে পড়লাম, হাঁটুদুটো জড়িয়ে ধরে জোরালো ভাষায় কাকুতি মিনতি জানাতে লাগলাম, আমায় যেতে দাও। হঠাৎ একটা হেঁচকা মারলাম জোরে, মাটিতে পড়ে গেল সৈনিকটা, কাদার মধ্যে। চট করে উলটিয়ে দিলাম ওকে মাটির দিকে মুখ করিয়ে, কাদা জলের মধ্যে চেপে ধরলাম মুখটা—যাতে চেঁচাতে না পারে। কিন্তু ও চেঁচাল না, শুধু চেষ্টা করতে লাগল পিঠের উপর থেকে আমাকে ফেলে দেবে। আমি দুহাতে ওর মুখটা আরও জোরে কাদার মধ্যে চাপতে লাগলাম, দম বন্ধ হয়ে গেল ওর। এবার আমি দৌড়লাম সেই গোলাবাড়ীর দিকে—যেখানে পোলদের বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। 'আরাডেক!' দেয়ালের একটা ফাঁক দিয়ে আমি ফিসফিস করে ডাকলাম। ওদের কান খুব খাড়া, পোলদের। আমার ডাক শুনতে পেল, গান থামিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে। ওর সঙ্গে চোখোচোখি হল আমার। 'বেরিয়ে আসতে পার

তুমি', চাপা গলায় বললাম আমি। 'হ্যাঁ, মেঝের ফাঁক দিয়ে', ও জবাব করলে। 'চলে এস তাহলে।' সঙ্গে সঙ্গে চারজন গোলাঘর থেকে উবু হয়ে বেরিয়ে এল, তিনজন আর আমার আরাডেক। 'সান্ত্রীটা কোথায়?' আরাডেক জিজ্ঞাসা করল। 'ওইখানে পড়ে আছে।' আমরা চুপি চুপি হামা দিয়ে এগোতে লাগলাম, একেবারে চুপি চুপি, মাটির সঙ্গে লেগে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, গর্জন করছে বাতাস। গাঁ ছেড়ে একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম আমরা। অনেকটা পথ চললাম একেবারে চুপ করে, পা চালিয়ে চলেছি, আমার হাত ধরেছে আরাডেক; হাতটা ওর গরম, কাঁপছে। ওঃ, কি ভাল লাগছিল আমার ওর পাশে চলতে, একটাও কথা কইছে না সে। এই কটাই আমার শেষ মুহূর্ত— আমার লোভাতুর জীবনের শেষ শুভ মুহূর্ত। অবশেষে এক মাঠের উপর এসে পেঁছিলাম। দাঁড়িয়ে গেলাম। তারা আমাকে ধন্যবাদ জানালে চারজনেই। ওঃ, কতক্ষণ ধরে কত কথাই বললে ওরা, সব কথা বুঝতেই পারিনি আমি। মন দিয়ে শুনতে থাকলাম, কিন্তু চোখ আমার লেগে রইল আমার মানুষটির উপর; ভাবতে লাগলাম, কি করবে ও। হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরল, আর ভারিক্কে চালে বলে উঠল...কি বলেছিল, ঠিক আমার মনে নেই, তবে যা বোঝাতে চেয়েছিল তা হল—পালাতে সাহায্য করেছি বলে কৃতজ্ঞতায় ও আমাকে ভালবাসবে এবার। আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলে উঠল, 'রানী আমার!' ভণ্ড কুত্তা কোথাকার! এমন ক্ষেপে গেলাম আমি, মারলাম লাথি, গালে চড় মারতেও গিয়েছিলাম, কিন্তু ও টলছিল, এবার লাফিয়ে উঠল। বিবর্ণমুখে দাঁড়িয়ে রইল আমার সামনে ভয় দেখানোর ভঙ্গীতে।..আর তিনজনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চোখ পাকাতে লাগল, কোন কথা বললে না কেউ। তাদের দিকে তাকিয়ে আমার মনে এল—হ্যাঁ, বেশ মনে আছে—মনে এল বিরক্তি ও অবজ্ঞা। আমি বললাম, যা—চলে যা। কুত্তাগুলো আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই এখন গিয়ে ওদের বলে দিবি তো আমরা কোন্ দিকে গিয়েছি?' কি নীচ, নয় কি? তবু তারা চলে গেল, আমিও চলে গেলাম।..পরদিন তোমার দেশের লোকেরা আমায় ধরে ফেললে, কিন্তু একটু পরেই ছেড়ে দিলে। এবার আমি বুঝতে

পারলাম, আমার বাসা বাঁধার সময় এসেছে। কোকিলের মত পরের বাসায় অনেক থেকেছি, আমার গতর বেড়ে গেছে, ডানা হয়ে গেছে দুর্বল, পালকের জেল্লাও নষ্ট হয়ে গেছে...হ্যাঁ, সময় এসে গিয়েছিল, তাই আমি চলে গেলাম গ্যালিশিয়া, সেখান থেকে ডব্রুজা। সেই থেকে আমি এখানেই আছি প্রায় ত্রিশ বছর হল। সোয়ামিও ছিল আমার, মোল্ডাভিয়ার লোক। বছরখানেক আগে সে মারা গেছে। আমি এখন এইভাবে দিন গুজরান করছি। একা...না, একা নয়, ওদের সঙ্গে।"

এই বলে বুড়ী সমুদ্রের দিকে হাত নাড়তে থাকে। সাগরবেলায় সব শান্ত হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে এক একটা ক্ষণিক ও বিভ্রান্তিকর আওয়াজ উঠে আবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

"ওরা আমায় ভালোবাসে। অনেক মনে-ধরা কথা বলি আমি ওদের, ওদের তা ভাল লাগে। ওরা সকলেই এখনো যোয়ান. ওদের সঙ্গে থাকতে বেশ লাগে। ওদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবি, আমি এক-দিন ওদের মতই ছিলাম।...শুধু আমাদের সময়ে লোকের তেজ ও শক্তি ছিল আরো অনেক বেশি, জীবন তাই ছিল অনেক অনেক আনন্দের, অনেক ভাল ..হ্যাঁ রে হ্যাঁ... !"

বুড়ী চুপ করে যায়। ওর পাশে বসে আমার মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। ও কিন্তু ঝিমোতে থাকে ; মাথা নাড়ে, আর বিড় বিড় করে চলে. .হয়ত প্রার্থনা করছে। সাগর থেকে একটা মেঘ উঠে আসে, ঘন কালো মেঘ, কিনারাগুলো ইতস্তত বন্ধুর, পাহাড়ের চূড়ার মত। স্টেপির দিকে এগিয়ে আসে মেঘ, চলার পথে চূড়া অনেক টুকরো ভেঙে যায়, সেগুলো ছুটে চলে সামনে, একটার পর একটা তারাগুলিকে ঢেকে ফেলে। সাগরের গর্জন আরো বেড়ে ওঠে, আমাদের থেকে একটু দূরে চুম্বনের, ফিসফিসানির ও দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ শোনা যায়। দূরে স্টেপির উপর একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে...। বাতাসে একটা অদ্ভুত গন্ধ নাকের ভিতর সুড়সুড়ি লাগায়, খারাপ করে দেয় মেজাজ। আকাশের বুকে এগিয়ে যেতে যেতে মেঘগুলো মাটিতে অনেক ছায়া ফেলে—যেন পাখীর ঝাঁক উড়ে চলেছে ; কখনো মিলিয়ে যায়, আবার দেখা যায়

তারপর...। চাঁদটা দেখা যাচ্ছে মেঘের গায়ে আব্ছা সাদা একটা তালির মত, পরক্ষণেই তাও মিলিয়ে গেল একরাশ ভুসো মেঘের আড়ালে। দূরে স্টেপিটা কালো এবং কঠোর, নিজের মধ্যে কি যেন লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল, নীল আলোর চমক দেখা গেল সেখানে। এক মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠছে, এখান থেকে ওখানে, তারপরই মিলিয়ে যাচ্ছে ; যেন কতগুলো লোক সারা স্টেপির উপর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু খুঁজছে, দেশলাই জ্বালছে, কিন্তু তখুনি তা নিবে যাচ্ছে বাতাসে। আগুনের শিখাগুলি নীলচে, কেমন যেন ভূতুড়ে মনে হয়।

"আগুনের শিখা দেখতে পাচ্ছিস?" ইজেরগিল আমাকে জিজ্ঞাসা করে।

"কি, ওই নীলগুলি?" সামনের দিকে দেখিয়ে আমি বলে উঠি।

"নীল? হ্যাঁ, ওইগুলিই...ওগুলো তাহলে শেষমেশ উড়ে বেড়াচ্ছে! বেশ, বেশ, আমি আর দেখতে পাচ্ছি না, অনেক কিছুই দেখতে পাইনে আর।"

"এ শিখাগুলো কোত্থেকে আসছে?" আমি জিজ্ঞাসা করি বুড়ীকে।

ওই শিখাগুলো সম্বন্ধে আমি আগেই কিছুটা শুনেছিলাম, কিন্তু বুড়ী ইজেরগিল কি বলে তা শুনতে ইচ্ছা হল।

"শিখাগুলো আসছে ডান্কোর বুকের আগুন থেকে", বলে বুড়ী। "এক ছিল মন, সেটা একদিন ফেটে জ্বলে উঠেছিল.. হ্যাঁ, সেই আগুন থেকেই আসছে ওই শিখাগুলো। ওর গল্প বলব তোকে আমি, এটাও একটা পুরানো গল্প...পুরানো, সব পুরানো! দ্যাখ্, সে যুগে অনেক কিছু ঘটত, আজকাল আর সেদিন নেই—বীরত্ব নেই, মানুষ নেই, গল্পও নেই...কেন?...বল্ না! বলতে পারলিনি ত? কি জানিস তুই? তোরা আজকালকার ছোকরারা জানিস কি কিছু? ছ্যাঃ ছ্যাঃ! পুরোনো দিনের দিকে ভালো করে যদি তাকিয়ে দেখিস, তোদের সব ধাঁধার জবাব পেয়ে যাবি।...কিন্তু তোরা ত তাকাস না, তাই কি করে বাঁচতে হয় তাও জানিস না...। আমি কি দেখি না, লোকগুলো কিভাবে জীবন কাটায়? সব দেখি রে, সব দেখি। চোখেই না হয় আগের মত ভাল দেখতে পাই না! তবু দেখি, লোকগুলো বেঁচে নেই—খুঁটে

খাওয়ার তালেই সারাটা জীবন গুজরান করে দেয়। জীবনে যা পাওয়ার মত, কিছুই না পেয়ে সারা জীবন খোয়ায় আর বরাতকে দোষ দিতে থাকে। আরে বরাতে কি করবে? যার যার বরাত নিজের হাতে! কত রকম লোকই ত দেখি আজকাল, কিন্তু তাকতওয়ালা লোক ত একটাও দেখি না! তাদের সব কি হল বল্ দেখি?...আর সুন্দর চেহারার লোকও দিন দিন কমে যাচ্ছে।”

বুড়ী চিন্তার মধ্যে ডুবে যায়, আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকে, বীর্যবান ও সুন্দর পুরুষ ও নারী কোথায় মিলিয়ে গেল। অন্ধকার স্টেপির দিকে বুড়ী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, যেন প্রশ্নের জবাব খুঁজছে।

চুপ করে বুড়ীর গল্পের প্রত্যাশা করি; ভয় হয়, যদি কিছু জিজ্ঞাসা করি, বুড়ী হয়ত আসল জিনিস ছুঁয়ে অন্য কথায় চলে যাবে।

তিন

“অনেক—অনেক যুগ আগে স্টেপিতে এক জাতের লোক বাস করত। তাদের তিন ধারে ছিল জঙ্গল। যেমন ছিল তারা স্ফূর্তি-বাজ তেমন ছিল তাদের গায়ের জোর ও সাহস। একদিন তাদের বরাতে দুঃখু নেমে এল। কোথা থেকে অন্য জাত এসে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিলে ওদের। সে জঙ্গল যেমন অন্ধকার তেমনি ভ্যাপসা; গাছগুলি অনেক পুরানো, ডালপালাগুলো জড়াজড়ি করে আকাশকে একদম রুখে দিয়েছে। সেই ঘন পাতার আড়াল ভেঙে সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছতে পারে না। কখনো যদি পৌঁছয়, এমন ভাপ্ ওঠে, তাতেই মরে যায় মানুষ। মেয়েরা আর বাচ্চাগুলো খুব কাঁদতে থাকে, পুরুষ-গুলো হতাশ হয়ে পড়ে। ওরা বুঝতে পারে, বাঁচতে হলে এ জঙ্গল ছাড়তে হবেই কিন্তু তা করতে হলে রাস্তা মাত্র দুটোঃ পুরানো গাঁয়ে ফিরে গিয়ে বসবাস করা চলে কিন্তু সেখানে শক্তিমান ও বদমাস শত্রুর পাল্লায় পড়তে হবে। সামনে এগিয়ে যাওয়া চলে, কিন্তু সেখানে পথ রুখে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যের দল ডালপালায় পরস্পর জড়াজড়ি করে, আর তারা নরম মাটি শক্ত করে কামড়ে আছে গিঁঠওয়ালা শিকড় গেড়ে।

দিনের বেলায় ধোঁয়াটে আঁধারে তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, একটু শব্দ নেই, একটু নড়ে না ; আর রাত্রিতে লোকগুলি যখন আগুন জ্বালে তখন তাদের চারপাশে যেন আরো বেশি করে চেপে ধরে। যে লোকগুলো বাস করে এসেছে স্টেপির খোলা ময়দানে, দিনরাত তারা দম বন্ধ হয়ে মরছে, অন্ধকার বদগন্ধ জঙ্গলের মধ্যে। ওদের পিষে মারতে চায় যেন জঙ্গলটা। গাছের মাথার উপর দিয়ে যখন হাওয়া ব'য়ে যায় তখন ওদের হালত হয় আরো ভীষণ, বোঁ বোঁ করে মড়াকান্নার মত শব্দ বইতে থাকে। লোকগুলির গায়ে জোর ছিল, এগিয়ে গিয়ে লড়াই করলে হারিয়ে দিতে পারত তাদের। কিন্তু যুদ্ধে মরার সাহস তাদের হল না : জাঁক করার মত পুরানো যুগের ধারা ছিল ওদের. ভয় ছিল, ওরা সবাই যদি মরে যায়, সে ধারাও নষ্ট হয়ে যাবে। তাই রাতের পর রাত তারা মনমরা হয়ে বসে বসে ভাবতে থাকে, বনের শন্‌শনানি ও পচা মাটির বিষাক্ত গন্ধের মধ্যে। তারা বসে থেকেছে আগুন জেবলে, আর সেই আগুনের আলোয় ছায়াগুলো নিঃশব্দে নেচে বেড়িয়েছে চার দিকে ; মনে হয়েছে, যেগুলো নাচছে তারা ছায়া নয়, বনের ও জলার ভূতগুলো জয়ের উৎসব করছে..লোকগুলো আর কি করে, বসে বসে ভাবতে থাকে শুধু। কিন্তু খাটুনিই বল্‌ বা মেয়েমানুষই বল্‌, দুশ্চিন্তার মত মানুষের শরীর মন আর কিছুতেই অমন ক্ষয়ে যায় না। তাই চিন্তায় চিন্তায় সবাই এরা দুব্‌লা হয়ে পড়ল। মনের মধ্যে জন্মাল ভয়, শক্ত হাতগুলো পর্যন্ত তাতে বাঁধা পড়ে গেল। পচা গন্ধে যারা মরছিল আর যারা জ্যান্ত শুয়ে জবুথবু হয়েছিল—সবার জন্যে কেঁদে কেঁদে মেয়েরা আতঙ্কের সৃষ্টি করল। বনের মধ্যে কাপুরুষদের মত কথা শুনতে পাওয়া গেল। প্রথম প্রথম খুব আস্তে তার পর ভয়ে ভয়ে, ক্রমে জোরে আরো জোরে শোনা গেল। লোকগুলোর মনে এরই মধ্যে ইচ্ছা জেগেছিল, শত্রুর কাছে গিয়ে স্বাধীনতা সঁপে দিবে ; মৃত্যুর ভয়ে তারা সবাই মুশড়ে পড়েছে, কিন্তু দাসের জীবন সম্বন্ধে একটুকু ভয় এল না কারুর মনে...এই সময় হাজির হল ডান্‌কো, একা, কারুর সাহায্য ছাড়াই সবাইকে বাঁচালে সে।"

মনে হল, ডান্‌কোর বুকের আগুনের এই গল্প ও প্রায়ই বলে

এসেছে, কারণ এখন এক অভ্যস্ত গানের সুরে ও বলে চলেছে : যেই বনের মধ্যে সেই হতভাগ্য ভয়তাড়িতের দল পচা মাটির বিষবাষ্পে ধুঁকে মরছে তারই মর্মরধ্বনির বাস্তব রূপ জেগে উঠল আমার মনে বুড়ীর ক্ষীণ ও কর্কশ কণ্ঠস্বরে।

"ডানকো ওদেরই একজন ছিল, যোয়ান বয়স, সুন্দর চেহারা। সুন্দর চেহারার লোকগুলো সব সময়ই সাহসী হয়। ডানকো বললে সাথীদের, 'ভেবে ভেবে পথ থেকে পাহাড় হটাতে পারবে না কোন দিন। যারা কোন কাজে হাত দেয় না, কোন কাজই কোন দিন করতে পারে না তারা। ভেবে ভেবে আর দুঃখু করে কেন আমরা বল খোয়াচ্ছি? ওঠো! জঙ্গল কেটে আমরা রাস্তা করে বেরিয়ে যাই। এ জঙ্গলের শেষ আছে নিশ্চয়ই—দুনিয়ায় সব কিছুরই শেষ আছে। চলো, এগিয়ে এসো!'"

"ওর দিকে চেয়ে সবাই বুঝতে পারে, এমন মানুষ ওদের মধ্যে আর নেই. ওর চোখে ফুটে ওঠে শক্তি ও প্রাণের আগুন।

"নিয়ে চল আমাদের", ওরা বলে ওঠে।

"ডানকো তাদের নিয়ে চলে...।"

কথা থামিয়ে বুড়ী স্টেপির দিকে তাকায়, আঁধার সেখানে আরও ঘনিয়ে এসেছে। বহু দূরে ডানকোর জ্বলন্ত হৃদয়ের শিখা ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠছে ক্ষণস্থায়ী ফোটা ফুলের মত।

"ডানকো পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে ওদের, এক হয়ে সবাই ওর পিছন পিছন যায়। ওর উপর বিশ্বাস হয় কি না। বড় কষ্টের পথ! চারদিক আঁধার, পায়ে পায়ে সেই জলাটা মানুষগুলোকে গিলে ফেলবার জন্যে তার পচা গন্ধে ভরা লোভী মুখ হাঁ করে এগিয়ে আসছে, গাছগুলো নিরেট দেয়ালের মত পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে; ডালপালাগুলো জড়াজড়ি করে আছে, শিকড়গুলো ছড়িয়ে আছে চার দিকে--যেন হাজার সাপ কিলবিল করছে। পায়ে পায়ে কি মেহনত, কতখানি রক্ত খোয়া যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে এইভাবে লড়াই করে এগোলো তারা. যত যায়, বন আরো ঘন হয়ে আসে, ওদের জোরও ফুরিয়ে যাওয়ার দাখিল। এবার ডানকোর বিরুদ্ধে ওদের গজগজানি শুরু হয়, ওরা

বলে, ছোক্‌রা কি বা জানে, আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে, তা-ই জানে না। কিন্তু মনের আনন্দে শান্তভাবে সবার আগে আগে চলতে থাকে ডান্‌কো।

"একদিন এল ঝড়, বনের মধ্যে গাছগুলো শন্‌ শন্‌ করে উঠল, ওদের বিরুদ্ধে কি যেন ভয়ের কথা কানাকানি করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। এমন অন্ধকার ঘিরে এল সারা জঙ্গলে, মনে হল, এই জঙ্গলের আদিকাল থেকে সবগুলো আঁধার রাত এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে। ঝড়ের সেই ভয় দেখানো ঝন্‌ঝনানির মধ্যে দৈত্যের মত গাছগুলো ঠেলে পথ করে এগোতে লাগল এই সামান্য লোকগুলো। এরা এগিয়েই চলল, দুলে দুলে দান'র মত এই গাছগুলো গড় গড় করতে লাগল রাগে ; আর গাছের মাথায় ঝলক দিয়ে বিজ্‌লী তার ভয়মাখানো নীল আলো ছড়িয়ে দিয়ে তখনি মিলিয়ে যেতে লাগল। ভয় পেয়ে গেল মানুষগুলো। বিজলীর ঝিলিক লেগে মনে হল, গাছগুলো যেন জিয়ন্ত—যেন গাঁঠওয়ালা হাতগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে, জড়াজড়ি করে ধরেছে ওদের চারপাশে, আটকে রাখবে ওদের, এই আঁধার গারদখানা থেকে পালাতে দেবে না ওদের। ডালপালার এই অন্ধকারের ভিতর থেকে কি যেন ভয়, কি যেন আঁধার, কি যেন হিমেল কট্‌কট্‌ করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। বড় কষ্টের পথ, বল ক্ষুইয়ে মনমরা হয়ে গেল লোকগুলো। কিন্তু সে দুর্বলতা মেনে নিতে শরম এল ওদের, কাজেই রাগ পড়ল গিয়ে সবার আগে এগিয়ে-চলা ডানকোর উপর। ওরা নালিশ করতে লাগল, কি করে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়, জানে না লোকটা। তুই কি ভাবিস ওদের ?

"বনের সেই ভয়মাখানো শব্দের মধ্যে কাঁপা আঁধারের মধ্যে রাগে ও মেহনতে ওরা থেমে দাঁড়াল ; গাল দিয়ে উঠল ডান্‌কোকে ঃ

"'হতভাগা কোথাকার! আমাদের যত দুঃখের জন্য তুই দায়ী, তুই নিয়ে এসেছিস আমাদের, শেষ করে দিয়েছিস একেবারে, এখন এর জন্য তোকে মরতে হবে।'

"'তোমরাই ত বললেঃ 'পথ দেখিয়ে নিয়ে চল আমাদের।' আমি নিয়ে এসেছি। ওদের সামনে বুক ফুলিয়ে বলে উঠল ডান্‌কো।

আমার সাহস আছে তোমাদের চালিয়ে আনবার, তাই এনেছি। কিন্তু তোমরা? কি করেছ নিজেদের জন্য? শুধু চলে এসেছ, লম্বা পাড়ি দেওয়ার মত জোরটুকু পর্যন্ত বাঁচিয়ে চলো নি, শুধু পা চালিয়েছ, ভেড়ার পাল যেমন চালায়!

"এই কথাগুলোতে ওরা আরো রেগে গেল শুধু।

"তুই মরবি, মরতে হবে তোকে," ওরা চীৎকার করে উঠল।

"বন শন্ শন্ আওয়াজ করে চলেছে, প্রতিধ্বনি উঠছে সে শব্দের, বিদ্যুতের ঝিলিক এক একবার টুকরো টুকরো করে ফেলছে অন্ধকারকে। যাদের জন্যে এত কষ্ট করেছে সে, তাদের দিকে তাকায় ডান্কো, দেখে, বুনো জানোয়ারের মত হয়ে গেছে ওরা। ওকে যারা ঘিরে ধরেছে তাদের কারু মুখে মানুষের চেহারা নেই এতটুকু, একটুও দয়া আশা করতে পারলে না ও কারুর কাছ থেকে। ডান্কোর মনের মধ্যেও রাগ জ্বলে উঠল, কিন্তু ওদের প্রতি দয়া বোধ করে ও চেপে রাখল সে রাগ। ওদের ও ভালোবেসেছে, মনে বিশ্বাস হচ্ছে, ওকে ছাড়া ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই প্রাণ বাঁচাবার জন্য ও আকুল হয়ে উঠল, যাতে সহজপথে ওদের পেঁছে দিতে পারে; মনের সে আবেগ জ্বলে উঠল ওর চোখে...। ওরা কিন্তু ভুল বুঝলে, ওর চোখ দেখে ভাবলে তা জ্বলে উঠেছে রাগে, মনের রাগই এত উজ্জ্বল করেছে ওর চোখদুটোকে। ওরা একপাল নেকড়ের মত তৈরি হয়ে দাঁড়াল, অপেক্ষা করতে লাগল, ডান্কোকে আক্রমণ করবে; তারপর ক্রমে এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলল ওকে, ধরে টুক্রো টুক্রো করে ফেলবে। ওদের মনের ভাব বুঝতে পারলে ডান্কো। সেই ভাবনায় ওর মনে আরও ব্যথা লাগল, মনের আগুন আরো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল চোখে।

"বনের মড়া কান্না তখনও গুমরে চলেছে, বাজ চলেছে হেঁকে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে...

"ওদের জন্য কি করতে পারি?" চীৎকার করে বলে উঠল ডান্কো। সে চীৎকারে মেঘের গর্জনও চাপা পড়ে গেল।

"হঠাৎ ও নিজের বুকটা খাম্‌চি দিয়ে ধরে, ছিঁড়ে ফাঁক করে ফেলে, তারপর হৃদপিণ্ডটা বার করে তুলে ধরে মাথার উপর।

"সূর্যের মত জ্বলতে থাকে সেটা, সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল। সারাটা বন চুপ মেরে যায়, মানুষের প্রেমের আলোয় আলো হয়ে ওঠে। আলোর ভয়ে অন্ধকার গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়, তারপর কাঁপতে কাঁপতে ঢুকে যায় জলাভূমির হাঁ করা লোভাতুর মুখের মধ্যে। তাজ্জব বনে গিয়ে থ মেরে যায় লোকগুলো।

"চল এগিয়ে যাই", চীৎকার করে ওঠে ডান্‌কো। জ্বলন্ত হৃদ-পিন্ডটা দিয়ে পথ আলো করে সামনের দিকে ছুট্ মারে।

"ঢেউয়ের মত ওরা সকলে পিছু নেয় ডান্‌কোর—যেন কোন্ জাদু মন্তর লেগেছে। বনের ভিতর আবার শন্ শন্ শব্দ ওঠে, গাছগুলো অবাক হয়ে দুলতে থাকে। কিন্তু লোকগুলোর দৌড়নর শব্দে বনের আওয়াজ চাপা পড়ে যায়। তারা জোরে ছুটতে থাকে সাহসের সঙ্গে, জ্বলন্ত হৃদপিন্ডের অদ্ভুত দৃশ্যের টানে। এখনো লোক মরতে থাকল, কিন্তু আজ আর কারো কোন নালিশ বা চোখের জল নেই। ডান্‌কো চলেছে আগে আগেই, আর তার হৃদপিন্ডটা অবিরত জ্বলছে।

"হঠাৎ বনটা তাদের সামনে দরজা খুলে দিলে, তার হাত দিলে ওদের, আর পিছনে পড়ে থেকে ঘোর জঙ্গলটা চুপ মেরে গেল। এবার ডান্‌কো আর তার দলের লোকেরা এসে ডুব মারলে সূর্যের আলো ও মুক্তবায়ুর সাগরে, বৃষ্টিতে সব দোষ কেটে গেছে হাওয়ার। পিছনে বনের উপর ঝড়ের গর্জন চলতে থাকে ; কিন্তু এখানে সূর্যের আলো, স্টেপিটা উঁচু হয়ে উঠেছে—যেন বুকভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে ; ঘাসের গায়ে গায়ে বৃষ্টির জহরৎ পড়ে ঝক্‌মক্ করছে মাঠ ; নদীটা সোনার মত জ্বল্ জ্বল্ করছে । সন্ধ্যা হয়ে এল, ডুবন্ত সূর্যের আলো ফুটে উঠেছে নদীর বুকে; ডান্‌কোর ছেঁড়া বুকের ভিতর থেকে যে লাল রক্তের ধারা বইছে তারই মত লাল।

"ডান্‌কো সাহস ও গর্বের সঙ্গে সামনে প্রসারিত স্টেপির দিকে ভালো করে দেখতে থাকে ; এই স্বাধীন মুলুকের দিকে তাকিয়ে আনন্দের সঙ্গে হেসে ওঠে ও, সে হাসিতে গর্বের আমেজ ধরা পড়ে। তার পর সে পড়ে যায়, আর ওঠে না।

"অতি আনন্দে ও আশায় ভরপুর হয়ে ওরা তাকিয়ে দেখলে না

যে ডান্‌কো মরেছে, দেখলে না যে তার সাহসী হৃদয়টা তার লাশটার পাশে তখনো জ্বলছে। শুধু একজন, আর সবার চেয়ে তার লক্ষ্য বেশি কি-না, তাই সে শুধু দেখতে পেল ; ভয় পেয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে, তারপর মাড়িয়ে দিলে সেই গর্বভরা হৃদয়টা...খান্‌ খান্‌ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল শিখা, তার পর গেল নিবে...

"সেই জন্যই ত ঝড়ের আগে স্টেপিতে নীল শিখা দেখা যায়!"

বুড়ীর মনোহর কাহিনীটি শেষ হয়ে এসেছে। সারাটা স্টেপির উপর বিরাজ করছে গভীর নৈঃশব্দ্য—যেন সাহসী পুরুষ ডান্‌কো যে মনের জোর দেখিয়েছিল তাতে বিস্মিত হয়ে গিয়েছে। অপরের জন্য নিজের জ্বলন্ত হৃদয় উপড়ে ফেলে প্রাণ দিয়েছিল সে, নিজের জন্য প্রতিদানে কিছু চায়নি। বুড়ী ঝিমুতে শুরু করে। ওর দিকে তাকিয়ে আমি ভাবি, আরো কত গল্প, কত স্মৃতি-কাহিনী আছে ওর মনে, আরও ভাবতে থাকি, ডান্‌কোর সেই বিরাট জ্বলন্ত হৃদয়ের কথা। আর মানুষের কল্পনাশক্তির কথা, যে কল্পনায় এত সব সুন্দর ও রোমাঞ্চকর উপকথা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

ইজেরগিল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ওর গায়ের শতচ্ছিন্ন পোশাক ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাতাস ওর শুকনো বুকটা অনাবৃত করে দিয়েছে। আমি ওর জীর্ণ দেহটাকে ঢেকে দিই, তার পর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি ওর পাশে। সারাটা স্টেপি জুড়ে তখন অন্ধকার নৈঃশব্দ্য। আকাশে মেঘগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে ধীরে, হতাশাভরে।...সাগরের শূন্যগর্ভ বিষাদমাখা গর্জনধ্বনি ভেসে আসছে আমার কানে।

গোর্কির ভাষায় ঃ "উপকথা হল একটি কাহিনী। কাহিনী রচনা করতে হলে ঘটনা-পুঞ্জের যোগফল থেকে মূল মর্ম গ্রহণ করে তাকে একটি চিত্রকল্পে নিহিত করতে হয়। তার ফলে আমরা পাই বাস্তববাদ। কিন্তু সত্যঘটনাপুঞ্জ থেকে গৃহীত ভাববস্তুটির সংগে যদি আমরা প্রকল্পের (হাইপথিসিস) যুক্তি অনুসারে যা আকাঙ্ক্ষিত এবং যার ভাবনা সম্ভবপর এমন কিছু যোগ করি, যাতে ভাবটি আরো এগিয়ে যায়, চিত্রকল্পটি আরো বর্ধিত হয়, তাহলে আমরা পাই রোমান্টিসিজম্‌। এই রোমান্টিকতাই রয়েছে উপকথার ভিত্তিমূলে; এবং তা খুবই উপকারী। কারণ, এর ফলে বাস্তবতা সম্পর্কে এমন এক বিপ্লবী মনোভাব সৃষ্টি করতে সাহায্য হয়, যার ফলে কার্যক্ষেত্রে বিশ্ব পরিবর্তিত হয়ে থাকে।" [বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের সমস্যা—পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯]

ম্যাক্সিম গোর্কি